প্রথম খণ্ড

শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

মহাপুরুষের বাণী

(১ম খণ্ড)

শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

প্রকাশক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী
আশ্রম করনীবাদ
বৈদ্যনাথ—দেওঘর

মূল্য এক টাকা

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী
আশ্রম করনীবাদ পোঃ
বৈদ্যনাথ-দেওঘর

(২) মাহেশ লাইব্রেরী
ব্রাঞ্চ :—২-১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

'১৩৫৯'

মুদ্রাকর—শ্রীদ্বিজদাস ভট্টাচার্য
কিশোর বাংলা প্রেস
২৫ বলরাম দে স্ট্রীট, কলকাতা-৬

শ্রীগুরু-ভক্তি মহিমা

(১)

অসংকল্প সাধন বলে কাম নাশ হয়।
কামনা-বর্জ্জিত হ'লে ক্রোধ হবে জয়॥
অর্থে অনর্থ-বুদ্ধি লোভ করে ক্ষয়।
তত্ত্ব বিচারণায় আশু দূরে যায় ভয়॥

(২)

আত্মবিদ্যা শোক আর মোহ করে নাশ।
মহতের উপাসনায় দম্ভ পায় বিনাশ॥
মৌন হ'লে জয় হয় যোগ অন্তরায়।
সার্ব্বভৌম ক্ষমা গুণে হিংসা হবে জয়॥

(৩)

দয়া দ্বারা জয় হবে দুঃখ আধিভৌতিক।
সমাধি সাধনে যাবে দুঃখ আধিদৈবিক॥
আধ্যাত্মিক-ক্লেশ যাবে যোগ-শক্তি বলে।
নিদ্রা জয় হবে সত্ত্ব-পরিবেশ মূলে॥

(৪)

সত্ত্ব গুণাধিক্যে হয় রজো তমো ক্ষয়।
উপরতির দ্বারা সত্ত্ব গুণ হবে জয়॥
এক এক দোষ যায় এক এক সাধন বলে।
সর্ব্ব দোষ যায় কিন্তু 'গুরু-ভক্তি' হ'লে॥

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

প্রস্তাবনা

যাঁর কৃপা হ'লে পঙ্গু চ'লে পার হয় পর্ব্বত শিখর,
বোবা বলে অবিরলে সুধাঝরী ছন্দময়ী গাথা।
কালা শোনে সুদূরের সুমধুর বীণার ঝঙ্কার,
পাদপদ্ম স্মরি তাঁর,—কৃষ্ণানন্দ কহে, 'পুণ্যগুরুকথা'॥

বৃন্‌হ ধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয়ে ব্রহ্ম শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। বৃন্‌হ ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি—যাহার অন্য নাম বড় বা মহান্। মন প্রত্যয়ের অর্থ নিরতিশয় অর্থাৎ অবধি-রাহিত্য। সুতরাং যিনি নিরতিশয় মহান্, যাঁহা অপেক্ষা বৃহৎ, ব্যাপক বা উৎকৃষ্ট আর অন্য কিছু নাই—তিনিই ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম-তত্ত্বের অপর নাম শ্রীগুরুতত্ত্ব, 'স এষ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।' যোগসূত্র ১।২৬

উক্ত ব্রহ্ম-তত্ত্ব নিখিল জীব ও জড় সমন্বিত উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশশীল এই বৈচিত্র্যময় চরাচর বিশ্বজগতের মূল কারণরূপে ওতঃপ্রোত রহিয়াছে। যাহা হইতে সমস্ত উদ্ভূত, যাহাতে সব স্থিত ও যাহার মধ্যে সব লয় হইতেছে—যাহা স্বরূপতঃ দেশ ও কালাতীত হইয়াও দেশ ও কালাধীন সকল পদার্থের আশ্রয় ও নিয়ামক, অথচ তাঁহাকে খুঁজিতে যাইয়া আমাদের বাক্য ও মন সন্ধান না পাইয়া প্রতিহত

হয়। কিন্তু সেই বাক্যাতীত মনোতীত অজ্ঞাত গুহ্য ব্রহ্ম-তত্ত্বকে যাঁহার সুসংস্কৃত বাণীই প্রকাশ করে অর্থাৎ যখন পরম ব্রহ্মতত্ত্ব সংঘাতরূপ দেহাদির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া নিজেকে পরিচ্ছিন্ন মনে করেন, বস্তুতঃ চিদানন্দময় হইয়াও অপূর্ণ ক্ষণিক বিষয়সুখ যোগে মুগ্ধ জীবরূপে পরম দুঃখ অনুভব করেন, তখন জীবের মনোমধ্যে জাগিয়া উঠে স্বরূপ-সন্ধান। সেই সময় যাঁহার অভ্রান্ত মধুর বাণী স্বস্বরূপ হইতে বিচ্যুত জীবকে সেই পূর্ণ আনন্দময় পরমপদের সন্ধান দেন তিনিই—'গুরু'।

জীব সুখের কাঙাল। আজ অপেক্ষা কাল কি করিয়া অধিক সুখ পাওয়া যাইতে পারে তার সন্ধানে সে ছোটে। সুখ যে সব সময় পায় তাও নয়, আবার যেটুকু পায় তাও ক্ষণিক ও বিস্বাদু। বিস্বাদু বলিলাম এইজন্য যে এরূপ সুখ 'পরিণামে বিষমিব' অর্থাৎ বিপাকে ইহা দুঃখজনক। বিষ সেবনে প্রাণ যেমন সঙ্কটের সম্মুখীন হয়, বিষয় সুখ সেবনেও মনুষ্য সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তবে যাঁহারা রাগদ্বেষ-বিমুক্ত অবস্থায় অবশ হইয়া প্রারব্ধ ভোগ করেন তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।

তথাপি সাধারণতঃ জীব প্রতিনিয়ত এই মরীচিকার পিছনে ছোটে। কিন্তু এই সুখের চেয়েও বড় জিনিষ আনন্দ কারণ সুখ প্রতিদিনের বস্তু হইলেও আনন্দ কিন্তু প্রত্যহের অতীত। তাই রাস্তার ধুলো সুখের পক্ষে হেয় হলেও,

আনন্দ সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে সেই হেয় ধূলোকেও বরণীয় করে তোলে। সেই জন্য যে চিত্ত এই নশ্বর সংসারের বাহ্য মনোমুগ্ধকর সুমধুর শব্দে, আরামপ্রদ রমণীয় কোমল-স্পর্শে, চক্ষু ঝলসান অনিন্দনীয় রূপে, মন-ভোলান মনোহর গন্ধে তথা লোভনীয় চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য ও পেয় মধুময় ছয় রসে যখন সদা সর্ব্বদা আসক্ত ও অস্থির হইয়া ইতস্ততঃ বিভ্রান্ত হইয়া থাকে, সেই আসক্ত চঞ্চল চিত্তকে যাঁহার অমোঘ বাণী অনাসক্ত ও সুশান্ত করে এবং ব্রহ্ম ও জীবের ঐক্য জ্ঞানরূপ পরমতত্ত্বকেও যাঁহার অনুভূতির বাণী প্রকাশ করে, তিনিই হইতেছেন—'জ্ঞানদাতা গুরুঃ' সাক্ষাৎ সংসারার্ণব তারকঃ, তাঁকেই বলা হয় ঘনকৃপামূর্ত্তি শ্রীগুরু। ইহারই অপর নাম লোক-গুরু।

ফলতঃ শ্রীগুরুর কৃপায় আমরা পাই—'আনন্দময়কে', যাঁকে পাইলে আর অন্য কোন কিছুরই পাওয়ার শেষ থাকে না 'যল্লাভান্নাপরোলাভঃ' অর্থাৎ ভূমা। তখন প্রত্যক্ষ হয়—'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'। ইহার ফলস্বরূপ প্রাপ্তি হয় পরম ও চরম সুখ—'ভূমৈব সুখম্'। শ্রুতি বলিতেছেন,—'আনন্দো ব্রহ্মনো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনঃ' অর্থাৎ তখন জীব অভয় পদে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং উহা লাভের জন্য চাই তীব্র ইচ্ছা এবং তৎসহ কর্ম্ম হওয়া চাই পরিশুদ্ধ। কেন না, প্রজাগণ যাহা কিছু সৎকর্ম করে তৎসমস্তই উহার. অনুগামী হয়, পক্ষান্তরে তদভিমুখীও করে,—'সর্ব্বং তদভিসমেতি যৎকিঞ্চিৎ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি'।

তাই উহার প্রাপ্তি জন্য আমাদিগকে উপহার পাণি হইয়া শ্রীগুরুর সান্নিধ্যে উপস্থিত হইতে হইবে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার মধ্যদিয়া। মনে রাখিতে হইবে,—প্রণিপাত কেবল শিষ্টাচারের বাহ্যিক অনুষ্ঠান নয়। এ এক বৈপ্লবিক অনুষ্ঠান—এ অনুষ্ঠান সাহায্যে শিষ্যকে আপন দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনকে সম্পূর্ণরূপে শ্রীগুরুর অধীন করিতে হয়। সর্ব্বতো-ভাবে তাহার স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্বকে শ্রীগুরুর চরণে বলি দিতে হয় এবং তত্ত্বানুসন্ধিৎসু মনে সংশয় নিরাকরণ জন্য তাঁহার নিকট সংশয় বিষয়ে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন রাখিতে হয়। কারণ সংশয় নিবারণ না হওয়া পর্য্যন্ত নিষ্ঠার উদয় হয় না, কেবল তাহাই নহে সংশয় নিবারণ না হওয়ার বিষময় ফল সম্ভাবনা সম্বন্ধে শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—'ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ' গীতা ৪।৪১, কিন্তু প্রশ্ন করিতে হয় প্রার্থনার রূপ দিয়া। পৃচ্ছা প্রার্থনার রূপ পায় তখন, যখন প্রার্থকের অজ্ঞতা পরিস্ফুট রূপে প্রকাশ পায় উহার মধ্যে এবং যাঁহার নিকট প্রার্থনা করা হয় তাঁহার প্রতিষ্ঠারও প্রকাশ থাকে তৎসহ। (যেমন গীতায় অর্জ্জুন শ্রীভগবানকে প্রশ্ন করিয়াছেন) সুতরাং আনুগত্যের মূল্যেই আমাদের 'সংশয়' মুক্ত হইতে হইবে। সেজন্য শ্রীগুরুর সেবা যথারীতি হওয়া আবশ্যক। তন্ত্র বলেন—'গুরু-সেবাং প্রকুর্ব্বানো গুরুভক্তিপরায়ণঃ,' গুরুভক্তিপরায়ণ বলিতে বুঝায় 'গুরু হতে শ্রেষ্ঠ বিশ্বে নাহি কিছু আর' জ্ঞানে তাঁহার অনুরক্ত হওয়া। আর

শ্রীগুরুর প্রতি অটুট পূর্ণ-শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে, কায়মনোবাক্যে শ্রীগুরুর সেবায় তৎপর থাকাই প্রকৃত সেবাপদ বাচ্য। শ্রীগুরুর সেবার জন্য শিষ্যের যেন কোন কিছুই অদেয় না থাকে। বক্ষ্যমান সেবায় শিষ্যের নিষ্ঠা হয় যখন শাস্ত্রানুশীলন ও সৎসঙ্গ প্রভাবে সত্য বুদ্ধিতে শ্রুতি ও শ্রীগুরুর বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে এবং যখন গুরুগতপ্রাণ হয় তখন শ্রীগুরুর শক্তি সঞ্চারিত হয় শিষ্য মধ্যে।

যেহেতু শিষ্য তখন প্রেয়ঃকে ছাড়িয়া শ্রেয়ঃকে আশ্রয় করে। তাই তার স্বার্থভাব দূরে যায় এবং সকামের স্থলে প্রতিষ্ঠা হয় নিষ্কামের। সুতরাং তাহার প্রাণ ও মন হয় দিব্য।

সেই হেতু তাহার মন আর ঐন্দ্রিয়ক সুখে আনন্দ পায় না বরং তীব্র জ্বালা অনুভব করে, তাই তখন মনে জাগে মুক্তির ইচ্ছা। সেই সময় দয়াল শ্রীগুরু জ্ঞানাঞ্জন শলাকা (জ্ঞান সাধন) দিয়া চক্ষু খুলিয়া দর্শন করান শ্রীগুরুর চিন্ময় মূর্ত্তি। যাঁহার অহৈতুকী ও অমোঘ কৃপাবলে শিষ্য পরমাত্মার (শ্রীগুরুতত্ত্বের) সহিত মিলিত হইয়া কৃতার্থতা লাভ করেন।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত শিষ্য উক্ত অবস্থায় উপনীত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে নানারূপ বিঘ্ন, বাধা ও পরীক্ষার মধ্য দিয়া ক্ষুরধার পথে অগ্রসর হইতে হয়। ক্ষুরধার পথ বলিলাম এই জন্য যে—মধ্যে মধ্যে অনাত্ম বিষয় সমূহ তাহাদের প্রতারিত করিবার চেষ্টা করে, এমন কি অধিকাংশ

ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করে এবং অনেকেই পূর্ণমাত্রায় প্রতারিত হয়ও, অর্থাৎ নানা কারণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।

যদিও জীবনে জগতের প্রয়োজন কম নয় তথাপি প্রয়োজন বলিতে কেবল ঐন্দ্রিয়ক ভোগ সুখই নহে অথচ জীব চাহে তাহাই। এভুল ভাঙার জন্য—পাওয়া না-পাওয়া রূপ সুখ ও দুঃখের সকল অবস্থার মধ্যে জীবের মন যেন থাকে জীবনের অমৃতময় কেন্দ্রে, যে স্থান তাহার চিরকালের আশ্রয়। বিত্তাৎ শ্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ঃ সেই—'বুদ্ধি গ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়' কে জীবনকেন্দ্রে না পাইলে জীবের চাওয়ার তৃষা মিটিবে না। সুতরাং একথা তাহাকে সজাগ হয়ে মনে রাখতে হবে—ভুললে চ'লবে না। সকলেই একদিন না একদিন অবশ্য কেবল অনুভবে নয় (কারণ অনুভব স্মৃতি-ভিন্ন জ্ঞান হওয়ায় হেতুর দোষে ভুলও হইতে পারে) মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করে হাতে নাতে পাবে। কিন্তু যতদিন না হৃদয়ে এ উপলব্ধির প্রকাশ হয়, হাতের নাগালের মধ্যে না আসে, ততদিন শ্রীগুরুর অশরীরী সত্তা আমাদের মনো মধ্যে সুপ্রকাশ থাকিয়া তাঁহার অম্লান বাণীর বিদ্যুৎ আলোক-শিখা আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে থাকিয়া পথ দেখায় এবং সেই বিচ্ছুরিত আলোকে আমাদের ভাব ও কর্ম্ম বিমল হয়।

শ্রীগুরুর কৃপায় যাঁহারা সাত্বিক শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত হন, (গীতা ১৭অ) তাঁহাদের সংশয় না থাকায় (রজোগুণের কার্য্য হইতেছে সংশয় উৎপন্ন করা) আর সে ভয় থাকে না।

শ্রীগুরুর প্রতি অটুট পূর্ণ-শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে, কায়মনোবাক্যে শ্রীগুরুর সেবায় তৎপর থাকাই প্রকৃত সেবাপদ বাচ্য। শ্রীগুরুর সেবার জন্য শিষ্যের যেন কোন কিছুই অদেয় না থাকে। বক্ষ্যমান সেবায় শিষ্যের নিষ্ঠা হয় যখন শাস্ত্রানুশীলন ও সৎসঙ্গ প্রভাবে সত্য বুদ্ধিতে শ্রুতি ও শ্রীগুরুর বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে এবং যখন গুরুগতপ্রাণ হয় তখন শ্রীগুরুর শক্তি সঞ্চারিত হয় শিষ্য মধ্যে।

যেহেতু শিষ্য তখন প্রেয়ঃকে ছাড়িয়া শ্রেয়ঃকে আশ্রয় করে। তাই তার স্বার্থভাব দূরে যায় এবং সকামের স্থলে প্রতিষ্ঠা হয় নিষ্কামের। সুতরাং তাহার প্রাণ ও মন হয় দিব্য।

সেই হেতু তাহার মন আর ঐন্দ্রিয়ক সুখে আনন্দ পায় না বরং তীব্র জ্বালা অনুভব করে, তাই তখন মনে জাগে মুক্তির ইচ্ছা। সেই সময় দয়াল শ্রীগুরু জ্ঞানাঞ্জন শলাকা (জ্ঞান সাধন) দিয়া চক্ষু খুলিয়া দর্শন করান শ্রীগুরুর চিন্ময় মূর্ত্তি। যাঁহার অহৈতুকী ও অমোঘ কৃপাবলে শিষ্য পরমাত্মার (শ্রীগুরুতত্ত্বের) সহিত মিলিত হইয়া কৃতার্থতা লাভ করেন।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত শিষ্য উক্ত অবস্থায় উপনীত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে নানারূপ বিঘ্ন, বাধা ও পরীক্ষার মধ্য দিয়া ক্ষুরধার পথে অগ্রসর হইতে হয়। ক্ষুরধার পথ বলিলাম এই জন্য যে—মধ্যে মধ্যে অনাত্ম বিষয় সমূহ তাহাদের প্রতারিত করিবার চেষ্টা করে, এমন কি অধিকাংশ

ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করে এবং অনেকেই পূর্ণমাত্রায় প্রতারিত হয়ও, অর্থাৎ নানা কারণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।

যদিও জীবনে জগতের প্রয়োজন কম নয় তথাপি প্রয়োজন বলিতে কেবল ঐন্দ্রিয়ক ভোগ সুখই নহে অথচ জীব চাহে তাহাই। এভুল ভাঙার জন্য—পাওয়া না-পাওয়া রূপ সুখ ও দুঃখের সকল অবস্থার মধ্যে জীবের মন যেন থাকে জীবনের অমৃতময় কেন্দ্রে, যে স্থান তাহার চিরকালের আশ্রয়। বিত্তাৎ শ্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ঃ সেই—'বুদ্ধি গ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়' কে জীবনকেন্দ্রে না পাইলে জীবের চাওয়ার তৃষা মিটিবে না। সুতরাং একথা তাহাকে সজাগ হয়ে মনে রাখতে হবে—ভুললে চ'লবে না। সকলেই একদিন না একদিন অবশ্য কেবল অনুভবে নয় (কারণ অনুভব স্মৃতি-ভিন্ন জ্ঞান হওয়ায় হেতুর দোষে ভুলও হইতে পারে) মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করে হাতে নাতে পাবে। কিন্তু যতদিন না হৃদয়ে এ উপলব্ধির প্রকাশ হয়, হাতের নাগালের মধ্যে না আসে, ততদিন শ্রীগুরুর অশরীরী সত্তা আমাদের মনো মধ্যে সুপ্রকাশ থাকিয়া তাঁহার অম্লান বাণীর বিদ্যুৎ আলোক-শিখা আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে থাকিয়া পথ দেখায় এবং সেই বিচ্ছুরিত আলোকে আমাদের ভাব ও কর্ম্ম বিমল হয়।

শ্রীগুরুর কৃপায় যাঁহারা সাত্ত্বিক শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত হন, (গীতা ১৭অ) তাঁহাদের সংশয় না থাকায় (রজোগুণের কার্য্য হইতেছে সংশয় উৎপন্ন করা) আর সে ভয় থাকে না।

তাই শ্রদ্ধালু শিষ্য ক্রমশঃ শ্রীগুরুর কৃপার সাহায্যে সংসার-সাগরের পারে চলিয়া যাইতে সক্ষম হয়। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—'গুরোঃ কৃপা বশাৎ পার্থ লভ্য আত্মা ন সংশয়ঃ'। সুতরাং—'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'।

তাই সার্থক জীবন লাভ জন্য,—দেশকালাতীত সত্যের শাশ্বত সুন্দরের অম্লান প্রেম ও অফুরন্ত আনন্দের সম্ভারে সকলের মনের ভাণ্ডার পূর্ণ রাখিতে—

'জপ কর 'ইষ্ট মন্ত্র' নমো 'বালানন্দ' পদে।
জন্ম তব ধন্য হবে গুরু কৃপা আশীর্ব্বাদে॥

—জয়গুরু—

সদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ
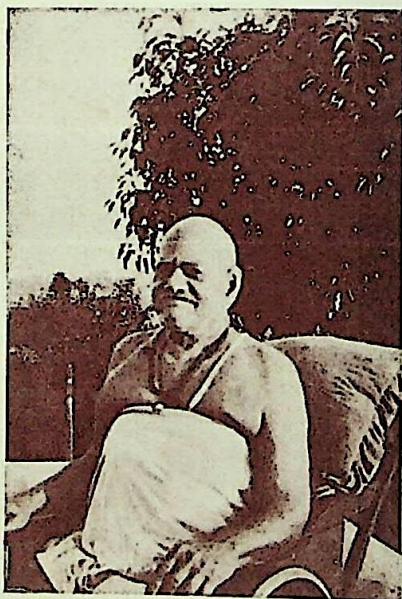
আলোক চিত্র

ইং ১৯৩৭ সাল।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রী৺বালানন্দ ব্রহ্মচারীজী মহারাজের সূক্ষ্ম পরিচয়

'যাঁর কৃপাবলে বলে মূক দিব্য-ভাষা।
নমি তাঁয় অহরহঃ—শ্রীপদভরসা॥'

বহু ঋষি মুনি ভারতের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তাঁহাদের ভাব ও কর্ম্মধারা যুগ যুগ ধরিয়া ভারতকে এবং বিভিন্ন দেশকে প্রভাবান্বিত করেছে। শতাব্দী পূর্ব্বে ঐরূপ এক মহাপুরুষ পুণ্য ভারতের শিপ্রা নদীর পবিত্র তটে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যাঁহাকে আমরা অনেকেই এই জীবনে পাইয়াছি, তাঁহারই সম্বন্ধে সামান্য কিছু জানাই।

সেই মহাপুরুষ, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ উজ্জয়িনী নগরীর উপকণ্ঠে, যেখানে মহর্ষি সান্দীপনি মুনির আশ্রম ছিল, যেখানে শ্রীভগবান বিদ্যাভ্যাসের জন্য গুরুগৃহে বাস করিয়াছিলেন, সেই পুণ্য নগরীর পবিত্র আবহাওয়ার মধ্যে এক সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পরিবারে শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারীজী মহারাজ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাতাপিতার একমাত্র সন্তান ছিলেন। নয় বৎসর

বয়সেই তাঁর উপনয়ন হয়। 'ব্রহ্ম-গায়ত্রী' উপদেশ পাইবামাত্র জাগিয়া উঠে তাঁর জন্মান্তর-স্মৃতি। সে কারণে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই মাতাপিতার স্নেহবন্ধন কাটিয়া এক অজানা মাতার কোলের আশায় গৃহত্যাগ করেন।

তিনি গর্ভধারিণী 'নর্ম্মদা দেবী'র কোল ছাড়িয়া আসেন মায়ার আকর্ষণ হইতে বহু দূরে কলিকালের মহাতীর্থ বিজন বনানী শোভিত—'নর্ম্মদা নদীর' কূলে। 'নর্ম্মদা দেবী'র কোলে ছিল মায়ার (বন্ধনের) স্পর্শ আর 'নর্ম্মদা নদী'র কূলে পাইলেন মুক্তির আস্বাদ। ঐ কূলেই তিনি পাইলেন এক 'মুক্ত যোগী-গুরু'। তখন তাঁর জীবন স্রোতে আসিল এক প্লাবন। নর্ম্মদার অপর নাম 'রেবা'। শাস্ত্র বলেন—'রেবা তটে তপঃ কূর্য্যাৎ'। তাই তিনি তত্তীরকে 'সাধনার বেদী' রচনা করে, কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত করেন কঠোর তপস্যায়। পরে আরম্ভ করলেন—'সাধন বেদী'র পরিক্রমা। যাহার পুণ্যফলে তিনি পাইলেন শিবক্ষেত্রে—'তপোবন'। যেখানে পরিচিতি (নির্ব্বিষয় জ্ঞান) লাভ ক'রে দর্শন হয় 'অভেদ আত্মার'।

তাই মনে আসে—সেই নববর্ষ বালকের মাতাপিতার স্নেহবন্ধনের ডোর কাটিয়ে মহাভিনিষ্ক্রমণের কাহিনী।

আরও মনে ভাসে—সেই নর্ম্মদা তীরে বিজন বনানী বেষ্টিত বিন্ধ্য-গিরি-গহ্বরে দুশ্চর কঠোর তপস্যার বার্ত্তা।

আবার মনে উঠে—সেই নর্ম্মদার পরিক্রমাকালে মাণ্ডলায়

ইংরেজ কালেক্টরের আদেশে Arsenic (শঙ্খ্যা) বিষ ভক্ষণের অদ্ভুত কথা এবং নর্ম্মদা মাতার কৃপায় জীবন রক্ষার গাথা।

জাগে মনে—সেই কামাখ্যার পথে '৺কামাখ্যা দেবী'র প্রত্যাদেশ—'তুই ফিরে যা' দৈব বাণী।

আরও জাগে মনে—প্রত্যাবর্ত্তনের পথে কলেরায় আক্রান্ত অবস্থাতে মায়ের অভয়বাণী—'তুই ভাবিস নি, তোর মৃত্যু হবে না'। সেই বাণী শ্রবণের পর গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হওয়ার ও জাগরণের পর খিচুড়ি ভক্ষণের কথা।

আবার জাগে মনে—ধুবড়ি হইতে ফিরিবার পথে, খাগড়ায়—'চিমটাঘাতে পাগল ভাল'র সংবাদ।

মনে পড়ে—সেই তারকেশ্বরের পথে মেমারীর কিয়দ্দূরে 'জলেশ্বর' মহাদেবের আদেশ বাণী—'পঞ্চমুণ্ডী'র আসনে 'অঘোর-মন্ত্র' জপ নির্দ্দেশের বিষয়। বলা হয়—'অঘোরান্না-পরো মন্ত্রঃ' অর্থাৎ অঘোর মন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মন্ত্র আর নাই।

আরও মনে পড়ে—সেই উত্তরাখণ্ড ভ্রমণ কালে ভাকুস্থতে 'খেচর সিদ্ধ মহাপুরুষ' দর্শনের কথা এবং ত্রিযুগী নারায়ণে 'কেদার-কল্প' অভ্যাসী—মহাত্মা মনসাগিরির দর্শন লাভ ও ভৈরব মন্ত্র প্রাপ্তি এবং তন্মন্ত্র জপে 'ভবিষ্যৎ জীবন পঞ্জিকা'র আভাস পাওয়ার কথা।

আবার মনে পড়ে—ভারতবর্ষ পর্য্যটন কালে সেই নগ্নপদ, কৌপীনধারী সুকোমল উজ্জ্বলতনু—স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি, নানা-স্থানে সময়ে সময়ে ক্ষুধা তৃষ্ণা—শীত উষ্ণ—তিরস্কার পুরস্কার

—বিশ্বাস অবিশ্বাস ও সুখ দুখের সহিত সংগ্রাম। যে সংগ্রামে মন হয় শান্ত, ইন্দ্রিয়গ্রাম হয় বশীভূত, বিষয়ে আসে উপরতি, দ্বন্দ্বে আনে সহিষ্ণুতা, বুদ্ধি হয় নির্ম্মল এবং ঈশ্বরে জাগে নির্ভরতা, তাহারই এক চিত্তাকর্ষক কাহিনী।

মনে জাগে—সেই অর্দ্ধ শতাব্দীরও পূর্ব্বে বৈদ্যনাথধামে শিবক্ষেত্রে,—'তপোবন পাহাড়ে'র এক নিভৃত গুহায় এক জ্যোতির্ম্ময় পরম আবির্ভাবকে, অমৃত সন্ধানী সেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের শাশ্বত আত্মার পরম প্রকাশকে। সেই গুহাকক্ষে ধ্যান মৌন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর তপোমার্জ্জিত চিত্তমুকুরে ধর্ম্মের সত্যরূপ ঔজ্জ্বল্যে প্রতিবিম্বিত হ'ল, এককে আপন আত্মার মধ্যে এবং বিশ্বের মধ্যে অনুভব ক'রে। সেই অভিন্নকে জ্ঞানের মধ্যে আবিষ্কার, প্রেমের মধ্যে উপলব্ধি, বিভিন্নের মধ্যে স্থাপন, কর্ম্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠা ও আচরণ দ্বারা শিক্ষা দিয়ে, মৃত্যুঞ্জয়ী মহাভারতের এই শাশ্বত ধর্ম্মের রূপ তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব ক'রলেন সকল সংশয় বিলুপ্তিতে। এই সর্ব্বানুভূতির অনিবার্য্য ও অব্যর্থ ফল হচ্ছে—'ঈশ্বর-প্রেম ও জীবে প্রগাঢ় প্রীতি। এই ঈশ্বর-প্রেম ও প্রগাঢ় জীব-প্রীতিই তাঁকে আগাইয়া দিয়াছে বৃহত্তর সত্য এবং পরিপূর্ণতার পথে। পঞ্চতন্মাত্রাশব্দাদি বিলসিত এই মাটীর পৃথিবীর সীমাহীন বৈচিত্র্যের মধ্যে তিনি লাভ করেছিলেন এক পরম ভাব— 'পরার্থ দৃষ্টিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা', ইহা ছিল তাঁর নিত্য আবৃত্তির বিষয়।

মনে আসে—তপোবনে অবস্থানকালে জনগণের উপর তাঁর বিরাট প্রভাব দেখে তাঁর প্রতি ঈর্ষাতুর হীনমনাদের কি ঘৃন্য আচরণ। তাঁর জীবন নাশের জন্যও অপচেষ্টা করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই তারা। আবার তাঁহাকে অবনমিত করিবার জন্য ধনমদ গর্ব্বিত বণিকের দাম্ভিক আস্ফালন ও হীন ষড়-যন্ত্রের কথা। অথচ আমি দেখেছি সেই বণিককে তাঁর শয্যা পার্শ্বে। আমি তাকে যেতে ব'লেছি, কিন্তু শ্রীগুরু ধীর প্রশান্ত ভাবে স্মিত সুন্দর মুখে আমাকে ব'লেছেন, 'তাহাকে থাকিতে দাও'। তাঁকে মধুর কণ্ঠে ব'লতে শুনেছি,—'বিছার স্বভাব দংশন করা আর সাধুর স্বভাব ক্ষমা করা'। তাঁর ক্ষমা-সুন্দর হৃদয় ছিল এইরূপ। শ্রীগুরুর প্রতি তাহাদের যতটা বিদ্বেষ ও ক্রোধ ছিল, ঠিক অনুরূপ ভাবেই তিনি তাহাদের প্রতি অন্তরে পোষণ করিতেন,—'ক্ষমা ও ভালবাসা'। সেই জন্যই পরে শ্রীগুরুর অবর্ত্তমানে আমি দেখেছি সেই বণিকের কি অনুশোচনা ! কি মনস্তাপ !! কি আর্ত্তনাদ !!! কি কান্না !!! আমার বিশ্বাস মনস্তাপের আগুনে পুড়ে সে শুদ্ধ হ'লো।

মনে ভাসে—সেই পুণ্যতীর্থ হরিদ্বারে ধ্যানাবস্থায় মানসনেত্রে ভাবী কর্ম্মসূচীর চিত্রপট দর্শনের কথা। (এ দর্শন টেলিভি-সন যন্ত্রে নয়—উক্ত যন্ত্রে বর্ত্তমান কর্ম্মের চিত্র দর্শন হয় মাত্র কিন্তু ভবিষ্যৎ কর্ম্মসূচীর চিত্র দর্শন হয় না) যাহা আজ বহুলোক হিতায় ও বহুজন সুখায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির সমবায়ে এক বিরাট আশ্রম গড়িয়া উঠিয়াছে।

এই যে আশ্রম, ইহা কেবল আশ্রম মাত্র নয়, অপিতু সেই মহাপুরুষের ভাবধারাই কর্ম্মধারার মধ্যে বাহ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার পিছনে রহিয়াছে সুমহান্ ঐতিহ্যের অনুপ্রেরণা। সেই শিবদ মূর্ত্তি, এক সময়ে যাঁহার বাস ছিল বৃক্ষমূলে বা গিরিগহ্বরে, যিনি ভারতের বন হইতে বনান্তরে ও গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভ্রমণ করিতেন। যিনি নিজ হস্তে কাষ্ঠ ও ফলমূল আহরণ করিয়া শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, তিনিই এই পবিত্র আশ্রমের প্রাণশক্তি ছিলেন। আজ যেখানে সকলে দেবমন্দির, সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়, মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়, দাতব্য ঔষধালয়, অতিথিশালা, গোশালা ও পুস্তকালয় দেখিতেছেন, তাহা এক সময়ে বিল্ববনে পরিপূর্ণ হিংস্র জন্তুর বাসভূমিরূপে পতিত জমি মাত্র ছিল। সেখানে আজ নিত্যবেদ পাঠ, শাস্ত্র আলোচনা, দেবসেবা, গোসেবা অতিথি ও সাধুসেবা এবং নানাপ্রকার যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ নানা সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে সর্ব্বদা মুখরিত। আজও তাঁর আশ্রমে সারা বৎসর জুড়িয়া নৃত্য করে নিত্য নবীন উৎবব।

রিক্ত, মুক্ত শ্রীগুরু ছিলেন মানব সমাজের অনুষ্ঠেয় ব্রত, নিয়ম, জপ, পূজা, উপাসনা, যজ্ঞ ও দান প্রভৃতি সৎকর্ম্মগুলির এক মূর্ত্ত প্রতীক। আবার তিনি আপামর জন সাধারণকে দুঃখ ও দুর্গতি থেকে মুক্ত করিবার জন্য সহজতম পথের কথাও বলিয়াছেন—'কলৌ নামৈব কেবলম্, কলৌ দানমেব কেবলম্'। কৃচ্ছ্রব্রত সাধনের পথেও নয় অথবা একান্তভাবে বিষয়-বিষ

সেবনেও নয়। দুর্গম, সাধন পথকে —'নাম' জপে (যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি) এবং 'বিষয়' রূপ বিষকে দানের মধ্য দিয়া অমৃত ক'রে (দানং দুর্গতি নাশনম্) মধ্যবর্ত্তী সহজ পন্থাকেই লোকের কাছে গ্রহণীয় করিয়া তুলিয়াছেন।

শুন্‌তে পেয়েছি তিনি বলিয়াছেন — 'ঈশ্বর মঙ্গলময়, তাঁর কার্য্য মঙ্গল দিয়া আবৃত, তাঁর মঙ্গল-হস্ত সর্ব্বত্র প্রসারিত, "সর্ব্বতঃ পাণিপাদং........সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি,' গীতা ১৩।১৩। এসব যা দেখ্‌ছ সবই যে তিনি, তাঁর এই সৃষ্টির মূলই হচ্ছে — তাঁর ইচ্ছা, 'ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা, তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়, তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ'। সেজন্য তিনি তোমাকে পৃথক করিতে পারেন না বা তুমিও পৃথক হইতে পার না।

শ্রীশ্রী৺বালানন্দ ব্রহ্মচারীজী মহারাজ মায়াময় জগৎ-সম্বন্ধে দুরূহ তত্ত্ব গবেষণার ঝঙ্কার না তুলিয়া, অস্থির জগতে বিশ্বাসের পালে কৃপার বাতাস পেয়ে জীবের জীবনতরী কি ক'রে 'ভগবদ্‌বন্দরে' স্থির হ'য়ে লাগবে, তার কথাই তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন— সেজন্য চাই — 'আত্মকৃপা'। উহাকে বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন— 'মনটাকে কম্পাসের কাঁটা কর' অর্থাৎ কম্পাসকে যেমন ভাবেই রাখা হউক না কেন, উহার কাঁটাটি যেমন নির্ভুলভাবে সর্ব্বদা উত্তর দিক্‌কেই আপনার বিষয় করে,—সেইরূপ সর্ব্ব পরিস্থিতির মধ্যে সকলের মন সব সময়ে সর্ব্বাবস্থায় গুঞ্জন করুক শ্রীভগবানের চরণাম্বুজের ভ্রমর হ'য়ে।

সংসার দুঃখ নিবৃত্তির জন্য যিনি এত কষ্ট বরণ করিয়াছেন, তিনিই হইলেন — অপরের দুঃখে দুঃখী। তিনি চলিয়াছেন ভারতের চলা পথ দিয়া —সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান নিয়া। সেইজন্য আশ্রমের ধর্ম্মমূল সেবা-প্রতিষ্ঠান ও শুভ-অনুষ্ঠানগুলি তাঁহারই পবিত্র স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ রহিয়াছে। এই সব প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়া তিনি মানব সমাজকে তাদের করণীয় কি ? তাহারই এক বাস্তব আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার ঔজ্জ্বল্য ও মাধুর্য্যকে অনেকের দেখিবার সৌভাগ্য হয়েছে। তিনি আশ্রমের ধ্যান কুটিরে রাখিয়াগিয়াছেন — তাঁর পাদুকা, ধূলিকণায় রহিয়াছে—তাঁর পদরেণু, ঘরবাড়ী গাছ পালায় রহিয়াছে — তাঁর মৃদুস্পর্শ, আকাশ বাতাসে রহিয়াছে—তাঁর উপদেশ বাণী, প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানে রহিয়াছে— তাঁর অনাবিল ভাব ও কর্ম্মধারা এবং নর্ম্মদা কুণ্ডে রহিয়াছে — তাঁর পাদোদক। তাই অনেকের নিকট এই আশ্রম — পুণ্য তীর্থ। সেই জন্য তারা এখানে দেখে — শ্রীগুরুর রূপ, শোনে — তাঁর কল্যাণময়ী বাণী, সম্মুখে পায় — তাঁর বাস্তব আদর্শ এবং অন্তরকে স্পর্শ করে—তাঁর অহৈতুকী কৃপা।

শ্রীশ্রী৺গুরু মহারাজজীর সন্নিকট সংস্পর্শে দীর্ঘকাল থাকার সৌভাগ্য লাভ ক'রে, তাঁর কৃপায় আমি তাঁহাকে 'ঊর্দ্ধমন্থী ও জীবন্মুক্ত' বলে জানি। ঊর্দ্ধমন্থী অবস্থা বিষয়ানন্দ জয়ের আর জীবন্মুক্ত অবস্থা পরমানন্দ প্রাপ্তির পরাকাষ্ঠা বলিলে ভুল হইবে না। ঊর্দ্ধমন্থীনের গতি সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত

বলেন — 'ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি'। আর জীবন্মুক্তের স্থিতি সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতা বলেন—'ন স পুনরাবর্ত্ততে'। শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ জীউর জীবন-বেদে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিরূপী ত্রিবেণীর অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

(ক) সরল ও সুন্দর ভাষায় জ্ঞান-গর্ভ উপদেশ দানে শিষ্য ও ভক্ত মণ্ডলীর অন্ধকার হৃদয়কে আলোকিত করিতেন।

(খ) নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা জীবের সেবা করিতেন।

(গ) কর্ম্ম ও জ্ঞান যাহাতে রসাল হয় তজ্জন্য উভয়কে উপাসনার মূর্চ্ছনা যোগে রসায়ন করিয়া ভারতীয় তপোবন সংস্কৃতির আদর্শকে সমাজ মধ্যে স্থাপন করিতেন।

যেহেতু তাঁর জ্ঞানে ছিল — ঋষি তুল্য অভ্রান্ত দৃষ্টি, কর্ম্মে ছিল যোগী সুলভ নিষ্কাম ভাব ও উপাসনায় ছিল দেবোপম নির্ভরতা, সেই হেতু এই সমন্বয় দর্শনের মূর্ত্ত বিগ্রহরূপেই তিনি প্রাচীন ভারতীয় তপোবন সংস্কৃতির ধারক ও পোষক ছিলেন। সেই জন্য বিভিন্ন অধিকারী তাঁর সান্নিধ্যে আসিয়া পাইতেন—'প্রেরণা ও শান্তি।'

তাই তাঁর নীরব আহ্বানে কত আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অভাবি মানুষ ছুটে এসেছে তাঁর পদ প্রান্তে। এসেছে ধনী দরিদ্র — পণ্ডিত মূর্খ। এসেছে — দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত ব্যাভিচারী পতিত। এসেছে — স্বধর্ম্ম-বিরোধী পরধর্ম্ম-মুগ্ধ ও ভ্রষ্ট চরিত্রের দল। এসেছে — মৃত পুত্র শোকাতুরা পাগলিনী জননী ও পতিহারা শোক বিহ্বলা সাধ্বী সতী। তিনি

দিয়েছেন তাদের সান্ত্বনা ও শান্তির সন্ধান। ভেঙেছেন তাদের মোহ। শ্রীগুরুর করুণ দৃষ্টিপাতে চির জীবনের মত ফিরে গেছে তাদের অমঙ্গল।

শ্রীগুরুর নিকট লেখকের প্রার্থনা—

'দাও গুরু আশীর্ব্বাদ মাগি—বার বার।
অন্তরে উঠুক জ্বলে দিব্য স্বরূপ তাঁর॥

মহাপুরুষের বাণী

(১)

ভারত-বিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় ৺বৈদ্যনাথ বাবার অর্চনানন্তর শ্রীশ্রীগুরু মহারাজজীর শ্রীচরণ দর্শন কামনায় আশ্রমে আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত শ্রীশ্রীগুরু মহারাজজীর গভীর দার্শনিক পরিভাষার অরুন্তুদ ঝঙ্কার-বিহীন চল্‌তি ভাষায় সরস ভাবের যুক্তিপূর্ণ মধুময় বার্ত্তালাপ যাহা হইয়াছিল, উহা আমি কীর্ত্তন করিতেছি। আপনারা শান্ত মনে পাঠ করুন।

পণ্ডিত মহাশয় শ্রীশ্রীগুরু মহারাজজীর শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া আসনে উপবেশন করিলেন। যথাসম্ভব স্বাগত প্রশ্নাদির পর শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভাই প্রমথনাথ! ৺বৈদ্যনাথ বাবার অর্চনা করিতে গিয়াছিলে, তিনি কি বলিলেন? মৃদু হাস্যে পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—মহারাজ! ৺বৈদ্যনাথ বাবা আমাদিগকে অনেক কথাই বলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা উহা উপলব্ধি করিতে পারি না। শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ বলিলেন,—দেবতার অর্চনাদি করা ভাল। তুমি বিদ্বান্, তুমি যে আচরণ করিবে, সমাজের আরও দশ জনে

তোমার সেই আচরণ অনুকরণ করিবে। গীতায়ও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্তে॥" গীতা ৩।২১

আমিও মহৎজনের পন্থাই অনুবর্ত্তন করিতেছি। একটি ঘটনার কথা তোমায় বলি,—বহুদিনের কথা। এক সময় সপত্নীক স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত ও পাইকপাড়া রাজার ম্যানেজার আসিয়াছিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মমতাবলম্বী ছিলেন। স্যার কে, জি, গুপ্ত আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহারাজ! পুতুল পূজা করা কি ভাল? আমি বলিলাম,—আপনি সুন্দর প্রশ্ন করিয়াছেন। আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব না। আমি মায়ীর সহিত বার্ত্তালাপ করিব, উহার মধ্যে আপনি প্রশ্নের উত্তর পাইবেন। আমি মায়ীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—মায়ী, যখন আপনি বালিকা ছিলেন তখন পুতুলখেলা করিতেন কি? উত্তরে মায়ী বলিলেন,—হাঁ বাবা, আমি পুতুলখেলা করিয়াছি। সকল মেয়েরাই পুতুল লইয়া খেলা করে। তখন মায়ীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এখন আপনি পুতুলখেলা করেন কি না? মায়ী বলিলেন, না বাবা, এখন আর পুতুলখেলা করি না। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, মায়ী! এখন আর পুতুল-খেলা করেন না কেন? তদুত্তরে মায়ী বলিলেন, বাবা! আমি

এখন সত্যিকারের খেলা করিতেছি, সেইজন্য আর মিথ্যা খেলা করি না। তখন আমি স্যার কে, জি, গুপ্তকে বলিলাম, বোধ হয় আপনার প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছেন। তিনি বলিলেন, মহারাজ! ইহার দ্বারা বুঝিলাম যে, যতক্ষণ সত্য না পাওয়া যায়, ততক্ষণ মিথ্যা লইয়া থাকিতে হয়। কিন্তু আপনি জ্ঞানী পুরুষ, তথাপি আপনি দেব দেবীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এখনও আপনি পুতুল পূজা করেন কি? আমি বলিলাম, ইহার উত্তরও মায়ী দিবেন। আমি মায়ীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এখন আপনি সত্যিকারের খেলা করিতেছেন, তাই পুতুল খেলা আর করেন না। কিন্তু যখন আপনার নিকট ছোট ছোট মেয়েরা পুতুল লইয়া আসে ও বলে, মা আমাদের পুতুল খেলা শিখাইয়া দাও, তখন আপনি তাদের সহিত পুতুল খেলা করেন কি? তদুত্তরে মায়ী বলিলেন, হাঁ বাবা! ছোট মেয়েদের আনন্দ দিবার জন্য আমিও তাহাদের সঙ্গে পুতুল খেলা করিয়া থাকি। তখন আমি স্যার কে, জি, গুপ্তকে বলিলাম, — আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরও মায়ী দিলেন। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্ বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥"

গীতা ৩।২৫

(সত্যবস্তু পাইয়াও জ্ঞানীজন মায়ীর পুতুল খেলার মত সাধারণকে শিক্ষা ও আনন্দ দিবার জন্য দেব দেবীর পূজা

করিয়া থাকেন।) ইহার রহস্য এই যে,—"প্রতিষ্ঠিত দেব দেবীর মুর্ত্তিতে মন্ত্রাত্মক ভগবৎ-সত্তা থাকায়, যথারীতি সাধনায় উক্ত সত্তা ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। কিন্তু পুতুলে যে কাল্পনিক সত্তা আরোপ করা হয়, পুতুলে উহা না থাকায় পুতুল পুতুলই থাকিয়া যায়, সত্তা ক্রিয়াবান্ হয় না। তবে ভাবনা গড়িয়া উঠে এবং ভবিষ্যতে জগতের ব্যবহারের সহিত মিলিয়া যায়।"

ইহা শুনিয়া স্যার কে, জি, গুপ্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন এ সম্বন্ধে বহু অনুসন্ধান করিয়াছি কিন্তু আজ আপনার যুক্তিপূর্ণ উপদেশে আমার ভ্রান্তি নিরাস হইয়াছে। আপনার দর্শনে শান্তি পাইলাম।

প্রমথনাথ! তুমি ৺ বৈদনাথ বাবার অর্চ্চনা করিতে গিয়াছিলে, ইহা উত্তম। লোক-শিক্ষার জন্য এইরূপ কর্ম্ম করাই প্রয়োজন। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—মহারাজ! আমি ১৫ বৎসরের পরে আপনার শ্রীচরণ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। আপনার অমৃতময়ী বাণী শ্রবণাবধি অন্তরে এক দিব্য আনন্দের স্পর্শ অনুভব হইতেছে। মধ্যে মধ্যে লোকমুখে আপনার কুশল সংবাদ পাই। কিন্তু সম্প্রতি একজন বলিয়াছিল, মহারাজের জরা আসিয়াছে, এখন তাঁহাকে বৃদ্ধ বলিয়া মনে হয়। ইহা শুনিয়া দুঃখই হইয়াছিল। কিন্তু আজ আপনার শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে আশ্চর্য্য হইতেছি। ১৫ বৎসর পূর্ব্বে

আপনাকে যেমন দেখিয়াছিলাম, আমার নয়ন আজও তেমনি দেখিতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজী বলিলেন, তুমি তোমার পবিত্র ভাব লইয়া দেখিতেছ, সেইজন্য আমার শরীরও তোমার চক্ষে পূর্ব্বের মতই রহিয়াছে। স্নেহ ও শ্রদ্ধা উভয়ই অসুন্দরকেও সুন্দর করিয়া তোলে। তোমার শ্রদ্ধা তোমাকে আরও সুন্দর করিয়া তুলিবে ইহাই আমার আশীর্বাদ।

অনন্তর শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজী একখানি গৈরিক রেশমী নামাবলী তাঁহার শরীরে জড়াইয়া দিলেন ও বলিলেন, আজ আমি তোমাকে চাপ্‌রাস্ দিলাম। ইহা অন্যকে দিবে না। সভা সমিতিতে যাইবার সময় এখানি ব্যবহার করিবে। দেখ, ইহাতে নাম ও রঙ্ দুইই আছে। নামাবলী তোমার অনেক আছে আর পাইবেও বহু। কিন্তু ইহার মূল্য নাই।

পণ্ডিত মহাশয় অশ্রুপূর্ণনয়নে বলিলেন—এই নামাবলী আপনার স্নেহের দান। ইহা আমার নিকট অত্যন্ত প্রিয় এবং ইহা পাইয়া আজ আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। আমি যতই অধম হইতে যাইতেছি, ততই আমি আপনার কৃপা পাইতেছি। এ অধমের প্রতি আপনার কৃপা অহৈতুকী আপনি দয়াময়।

পণ্ডিত মহাশয়ের ভক্তিভাবে সকলেই এক দিব্য আনন্দের অনুভব পাইয়াছিল।

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ বলিলেন—দয়াময় বড় নহেন। দয়ার পাত্রই বড় হয়। দয়ার পাত্র না পাইলে দয়া রাখিব কোথায়? আমার দয়া যদি পাত্র না পায়। প্রমথনাথ! বল দেখি, ভগবান বড় না ভক্ত বড়?

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, মহারাজ! ভক্তই বড়। তখন শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ বলিলেন—তাহা হইলে তোমার ভক্তি-ভাব বড় আর আমার দয়া ছোট বলিয়া, তাঁহার প্রাণখোলা হাসির তরঙ্গ উঠিল। উহা সকলের হৃদয় ভরিয়া বাহ্যে প্রকাশিত হইল। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, মহারাজ! আমি ভক্তি চাই কিন্তু পাই না।

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ বলিলেন, তুমি ভক্তি পাইবে না কেন? ভক্তি তো তোমার কাছেই রহিয়াছে। তবে অন্যরূপে নিম্নগামী হইয়া। উহাকে উপরে উঠাইয়া লইলেই হইল। (ভক্তির স্বরূপ চারি প্রকার। প্রথম—মোহ, দ্বিতীয়—স্নেহ, তৃতীয়-প্রীতি ও চতুর্থ—ভক্তি।) শরীরের প্রতি, সম্পত্তির প্রতি, নাম ও যশের প্রতি মোহ হয়। দেখ, অর্থ উপার্জ্জনের জন্য স্ত্রী পুত্র, বন্ধু ও বান্ধব ছাড়িয়া কতদূর দেশে চলিয়া যায়। আংশিক রূপে আপনার শরীর অপরের নিকট বিক্রয় করিয়া দেয়। মনকেও অপরের অনুগামী করে, তবে অর্থ উপার্জ্জন হয়। ভগবানকে পাইবার জন্য কেহ কি এত কষ্ট স্বীকার করে? বলা যাইতে পারে—না। তবে যে কষ্ট স্বীকার করে সেঅবশ্য

পায়। পুত্রের প্রতি স্নেহ হয়। দেখ, যতদিন পুত্র হয় না, উত্তম খাদ্য পাইলে নিজে খায়। ভাল কাপড় পাইলে নিজে পরে। আর পুত্র হইলে বলে—আমি অনেক খাইয়াছি পরিয়াছি। ইহা পুত্রকে দিব। নিজে না খাইয়া না পরিয়া পুত্রকে খাওয়াইবে পরাইবে। কত কষ্টের উপার্জ্জিত অর্থ পুত্রের জন্য রাখিবার চেষ্টা করিবে। ইহাকেই স্নেহ বলে।

এ সম্বন্ধে এক সুন্দর কথা আছে—এক সাধুর এক শিষ্য ছিল। সাধু সমস্ত সময় ভজন পূজনে ব্যস্ত থাকিতেন। শিষ্য তাঁহার সমস্ত কাজ কর্ম করিত। একদিন শিষ্যের আসিতে বিলম্ব হয়। সাধু শিষ্যকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলে, আজ আমার আশীর্ব্বাদী হইল, সেই জন্য কিছু বিলম্ব হইয়াছে। ইহা শুনিয়া সাধু বলিলেন—তুমি আমার হইতে পৃথক হইলে। তোমার দ্বারা আমার আর কোন সেবা হইবে না। শিষ্য বলিলেন না বাবা, আমি আপনার সেবা ছাড়িব না। সাধু বলিলেন—না—না—-তোমার বিবাহ হইবে। তোমাকে অর্থ উপার্জন করিতে হইবে। তুমি কি করিয়া আমার সেবা করিবে। কিছু দিন পরে শিষ্য নিবেদন করিল—বাবা, আজ আমার বিবাহ হইল। সাধু বলিলেন—এখন তুমি মাতা পিতা হইতেও পৃথক হইলে। শিষ্য বলিলেন বাবা, আপনি এরকম বলিতেছেন কেন? সাধু বলিলেন—এখন যাহা কিছু উপার্জন করিবে, উহা পিতামাতাকে

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ বলিলেন—দয়াময় বড় নহেন। দয়ার পাত্রই বড় হয়। দয়ার পাত্র না পাইলে দয়া রাখিব কোথায়? আমার দয়া যদি পাত্র না পায়। প্রমথনাথ ! বল দেখি, ভগবান বড় না ভক্ত বড় ?

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, মহারাজ ! ভক্তই বড়। তখন শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ বলিলেন—তাহা হইলে তোমার ভক্তি-ভাব বড় আর আমার দয়া ছোট বলিয়া, তাঁহার প্রাণখোলা হাসির তরঙ্গ উঠিল। উহা সকলের হৃদয় ভরিয়া বাহ্যে প্রকাশিত হইল। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, মহারাজ ! আমি ভক্তি চাই কিন্তু পাই না।

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ বলিলেন, তুমি ভক্তি পাইবে না কেন ? ভক্তি তো তোমার কাছেই রহিয়াছে। তবে অন্যরূপে নিম্নগামী হইয়া। উহাকে উপরে উঠাইয়া লইলেই হইল। (ভক্তির স্বরূপ চারি প্রকার। প্রথম—মোহ, দ্বিতীয়—স্নেহ, তৃতীয়-প্রীতি ও চতুর্থ—ভক্তি।) শরীরের প্রতি, সম্পত্তির প্রতি, নাম ও যশের প্রতি মোহ হয়। দেখ, অর্থ উপার্জ্জনের জন্য স্ত্রী পুত্র, বন্ধু ও বান্ধব ছাড়িয়া কতদূর দেশে চলিয়া যায়। আংশিক রূপে আপনার শরীর অপরের নিকট বিক্রয় করিয়া দেয়। মনকেও অপরের অনুগামী করে, তবে অর্থ উপার্জ্জন হয়। ভগবানকে পাইবার জন্য কেহ কি এত কষ্ট স্বীকার করে ? বলা যাইতে পারে—না। তবে যে কষ্ট স্বীকার করে সেঅবশ্য

পায়। পুত্রের প্রতি স্নেহ হয়। দেখ, যতদিন পুত্র হয় না, উত্তম খাদ্য পাইলে নিজে খায়। ভাল কাপড় পাইলে নিজে পরে। আর পুত্র হইলে বলে—আমি অনেক খাইয়াছি পরিয়াছি। ইহা পুত্রকে দিব। নিজে না খাইয়া না পরিয়া পুত্রকে খাওয়াইবে পরাইবে। কত কষ্টের উপার্জ্জিত অর্থ পুত্রের জন্য রাখিবার চেষ্টা করিবে। ইহাকেই স্নেহ বলে।

এ সম্বন্ধে এক সুন্দর কথা আছে—এক সাধুর এক শিষ্য ছিল। সাধু সমস্ত সময় ভজন পূজনে ব্যস্ত থাকিতেন। শিষ্য তাঁহার সমস্ত কাজ কর্ম করিত। একদিন শিষ্যের আসিতে বিলম্ব হয়। সাধু শিষ্যকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলে, আজ আমার আশীর্ব্বাদী হইল, সেই জন্য কিছু বিলম্ব হইয়াছে। ইহা শুনিয়া সাধু বলিলেন—তুমি আমার হইতে পৃথক হইলে। তোমার দ্বারা আমার আর কোন সেবা হইবে না। শিষ্য বলিলেন না বাবা, আমি আপনার সেবা ছাড়িব না। সাধু বলিলেন—না—না—-তোমার বিবাহ হইবে। তোমাকে অর্থ উপার্জন করিতে হইবে। তুমি কি করিয়া আমার সেবা করিবে। কিছু দিন পরে শিষ্য নিবেদন করিল—বাবা, আজ আমার বিবাহ হইল। সাধু বলিলেন—এখন তুমি মাতা পিতা হইতেও পৃথক হইলে। শিষ্য বলিলেন বাবা, আপনি এরকম বলিতেছেন কেন? সাধু বলিলেন—এখন যাহা কিছু উপার্জন করিবে, উহা পিতামাতাকে

না দিয়া স্ত্রীকে দিবে। বহুদিন পরে শিষ্য বলিলেন—বাবা, আমার একটি পুত্র হইয়াছে। তখন সাধু বলিলেন—বাছা এখন তুমি নিজ হইতেও পৃথক হইলে। যত দিন তোমার স্ত্রী পুত্র হয় নাই—তখন ভাল খাদ্য পাইলে তুমি খাইয়াছ, ভাল বস্ত্র পাইলে তুমি পরিয়াছ। এখন যাহা পাইবে স্ত্রী ও পুত্রকে দিবে। তজ্জন্য তুমি নিজ হইতেও বঞ্চিত হইলে।

প্রমথনাথ! দেখ, মনুষ্য পুত্রের নিমিত্ত অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়াও নিজেকে বঞ্চিত করে। কিন্তু এই স্নেহ ও ত্যাগ যদি ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য হয় তাহা হইলে উহা ভক্তিরূপে পরিণত হইবে, আর পুত্রের প্রতি আসক্তিবশতঃ উক্ত স্নেহ ও ত্যাগ নিম্নগামী হইয়া যায়, যাহার পরিণাম আদৌ কল্যাণজনক নহে।

স্ত্রী ও বন্ধু বান্ধবের প্রতি যে ভালবাসা উহাই হইতেছে প্রীতি। মনুষ্য স্বার্থান্ধ হইয়া কত ত্যাগ স্বীকার করে। সেই প্রীতি ও ত্যাগ যদি ঈশ্বরের জন্য হয়, তাঁহার প্রসন্নতার জন্য হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রীতি ও ত্যাগ উর্দ্ধগামী হইয়া অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে পারে। এই মোহ, স্নেহ ও প্রীতি যখন ঈশ্বরাভিমুখী হয় তখন ইহাদের রূপ হয় ভক্তি। নিষ্কাম চিত্তেই ভক্তির বাসস্থান। সেইজন্য তথায় শ্রীভগবানের পীঠ। সকাম চিত্তে ভক্তি দাঁড়ায় না। কামনা পূর্ণ হইলে কামনা বাড়িয়া যায়, তজ্জন্য ভক্তি সরিয়া দাঁড়ায় এবং

কামনা পূর্ণ না হইলেও আদর বুদ্ধি না থাকায় ভক্তি থাকে না। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"ভোগৈশ্বর্য্য প্রসাক্তানাং ভয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥" গীতা ২।৪৪

সেই জন্য সকামী স্থিরতা প্রাপ্ত হয় না আর নিষ্কামী শান্ত হইয়া যায় ও প্রসন্নতা লাভ করে। শাস্ত্র বলিয়াছেন— "অশান্তস্য কুতঃ সুখম্" ?

ভাই প্রমথনাথ! নিষ্কামী কাহাকে বলে? পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন— যিনি ঈশ্বরের নিকট কিছুই চাহেন না, কেবলমাত্র তাঁহাকেই চাহে, তিনিই হইলেন নিষ্কামী। শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ বলিলেন---হাঁ, ঈশ্বর নিষ্কাম, তজ্জন্য তাঁহার প্রাপ্তিজন্য যে কামনা উহাকেও নিষ্কাম বলা যায়। কিন্তু নিষ্কামী ঈশ্বরের নিকট কোন কিছু প্রত্যাশা না করিয়া কেবল মাত্র তাঁহাকেই ভালবাসিবে, তাঁহার হইয়া যাইবে। শ্রুতি বলিতেছেন— যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্! (কঠোপনিষদ্ ১।২।২২) তাঁহাকে ভালবাসিলে, তাঁহার হইলে তবে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে। তাঁহাকে ভালবাসিতে হইলে, তাঁহার হইতে হইলে, তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে হইবে। এখন দেখা যাক্ কি উপায়ে আমরা তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে পারি। শ্রীভগবান বলিতেছেন—

"ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥
এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্॥"

গীতা ১৬।২১-২২

উক্ত শ্লোকে বলা হইয়াছে—অধোগতির মূল কারণ কাম, ক্রোধ ও লোভ। এই তিনটী নরকের কারণস্বরূপ। এই তিনটি ত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃ আচরণ করিলে ভগবানকে পাওয়া যায়। কি উপায়ে ইহাদিগকে ত্যাগ করা যাইবে এবং শ্রেয়ঃ-সাধন কর্ম্মই বা কি? উহা গীতার ১৬।১৪ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। সেই জন্য (কি ভাবে জীবন যাপন করিলে কাম, ক্রোধ ও লোভ জয় করিয়া নিজের আধ্যাত্মিক মঙ্গল ও সমাজের হিতসাধন হইতে পারে, তাহা তিনি শাস্ত্র-মুখে বলিয়াছেন; উহা পালন করিতে হইবে) তবে তাঁহাকে ভালবাসা হইবে এবং তাঁহার হওয়া যাইবে। তখন শ্রীভগবান্‌ও তাহাকে ভাল বাসিবেন ও তাহার হইবেন। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

ভক্ত ভগবানকে চাহে না, ভক্ত ভগবানকে ভালবাসে। ভক্ত বলে "ভগবান আমার।" এ সম্বন্ধে একটি উদাহরণ আছে—

কোন মহাপুরুষ এক রাজ-উদ্যানের সম্মুখে উপস্থিত

হইলেন। দেখিলেন, রাজা উদ্যানে বেড়াইতেছেন। মহাপুরুষ তাঁহার ভক্তির বিষয় অবগত ছিলেন তথাপি পরীক্ষা করিবার মানসে তিনি রাজার নিকট আসিলেন। রাজা যথারীতি স্বাগত সম্ভাষণসহ মহাপুরুষের শ্রীচরণে প্রণাম করিলেন,—মহাপুরুষ আশীর্ব্বাদানন্তর জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই রাজপ্রাসাদ কি আপনার? রাজা বিনম্র স্বরে বলিলেন—না মহারাজ, এই প্রাসাদ ভগবানের। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া পুনরায় মহাপুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন—এই সুন্দর বাগান কাহার? রাজা মধুর স্বরে বলিলেন—এই বাগানও ভগবানের। আরও কিয়দ্দূর আসিয়া সম্মুখে এক পদ্মশোভিত স্বচ্ছ সরোবর দেখিলেন। মহাপুরুষ রাজাকে স্মিতহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই সরোবর বোধ হয় আপনার? তদুত্তরে রাজা বলিলেন, না—ইহাও ভগবানের। সরোবরের সম্মুখে এক শুভ্র প্রস্তরময় মন্দির দেখিয়া মহাপুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন—এই মন্দির? রাজা বলিলেন, এ মন্দিরও ভগবানের। মন্দিরের মধ্যে নানা রত্ন খচিত স্বর্ণাসনে ভগবান্ বিরাজ করিতেছেন। মহাপুরুষ ভগবানকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবান্ কাহার? তখন অশ্রুসজল রাজা রুদ্ধকণ্ঠে করজোড়ে বলিলেন—ভগবান্ আমার।

ভাই প্রমথ নাথ? দেখ, ভক্ত কি উপায়ে ভগবানকে আপনার করিয়া লয়। সমস্ত ঐশ্বর্য্য ভগবানের আর

ভগবান্ ভক্তের। যখন ভগবান্ ভক্তের হইয়া যান তখন অন্য কিছুই বাকী থাকে না। শ্রীভগবানের সহিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভক্তের হইয়া যায়। (স্বয়ং ঈশ্বর যাঁহার কাম্য তাঁহাকে নিষ্কামী কি করিয়া বলা যায়? তিনি সর্ব্বকামী নয় কি? তবে ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য যে ইচ্ছা উহাকেই কামনা বলা হয়। আত্মপ্রসাদ কামনা নহে।) ঈশ্বর নিষ্কাম ও অতীন্দ্রিয় তজ্জন্য তৎপ্রাপ্তির জন্য যে কামনা উহাকেও নিষ্কাম বলায় ক্ষতি নাই। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—ভক্তি শাস্ত্রে আছে—

"আত্মেন্দ্রিয় সুখ ইচ্ছা তারে বলে কাম।
কৃষ্ণ সুখ বাঞ্ছা যাহা ধরে প্রেম নাম॥"

ইহার ভাব এই যে,—নিজ ইন্দ্রিয়-সুখ-ইচ্ছাকেই কাম বলে আর কৃষ্ণের সুখের জন্য যে ইচ্ছা উহাকে প্রেম বলা হয়। হে ভগবান্! আমি সুখ চাহি না। আপনি সুখী হউন। এইরূপ যে ইচ্ছা উহাই হইতেছে নিষ্কাম। শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ বলিলেন, হাঁ ভাই, ভাবনাকে উল্টাইয়া দিলেই সোজা হইবে। এ সম্বন্ধে এক কথা আছে—

এক সুপণ্ডিত বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও শান্তি না পাওয়ায় কোন সাধুর শরণ লইলেন। পণ্ডিতজী সাধুকে নিবেদন করিলেন যে—বাবা, আমি সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি কিন্তু শান্তি পাইতেছি না। আপনি আমার শান্তির উপায় উপদেশ করুন। তখন সাধু বলিলেন,—আপনি নদীতে স্নান করিয়া

আসুন, আমি আপনাকে উপদেশ করিব। পণ্ডিতজী স্নান করিয়া উপরে উঠিতেছেন, এমন সময় একটি মৎস্য তাঁহাকে বলিল—পণ্ডিতজী, আমি জলে বাস করি তথাপি আমার পিপাসা-নির্ব্বৃত্ত হয় না। আপনি আমার পিপাসা-নির্ব্বৃত্তির উপায় উপদেশ করুন। পণ্ডিতজী তো সুপণ্ডিত ছিলেনই, তিনি উপদেশ করিলেন,—তোমার গলার পার্শ্বেই ছিদ্র রহিয়াছে তজ্জন্য জল পান করিলেই ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া যায়। সুতরাং তুমি মুখে জল লইয়া উল্টাইয়া যাও। তাহা হইলে জল বাহির হইয়া যাইবে না, তখন তোমার পিপাসা নির্ব্বৃত্তি হইবে।

অনন্তর পণ্ডিতজী সাধুর নিকট আসিয়া উপদেশ ভিক্ষা করিলেন। সাধু বলিলেন—আপনি মৎস্যকে যে উপদেশ দিয়াছেন, আপনার জন্যও উহাই উপদেশ। মৎস্য যেমন নদীতে থাকিয়াও জল পান করিতে জানিত না, আপনিও তেমনই শান্তিরূপ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও শান্তি পাইতেছেন না। শাস্ত্র হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদনুরূপ আচরণ করিলে শান্তি পাওয়া যায়। আপনিও মৎস্যের ন্যায় উল্টাইয়া যান, তাহা হইলে সোজা হইয়া যাইবে। উক্ত সাধু সিদ্ধ-পুরুষ ছিলেন। পণ্ডিতজীকে বুঝাইবার জন্য তিনিই মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া সঙ্কেতের দ্বারা উপদেশ করিয়াছিলেন।

প্রমথ নাথ, এই সংসারাভিমুখী বৃত্তিকে ঈশ্বরাভিমুখী

করিতে হইবে। যে ভজনে, দানে, তপস্যায়, যজ্ঞে ও কর্ম্মে চিত্তবৃত্তি ঈশ্বরাভিমুখী থাকে না বা হয় না, উহা বন্ধনের কারণ হয়, তজ্জন্য শান্তি পাওয়া যায় না।

এই সংসারাভিমুখী বৃত্তিকে ঈশ্বরাভিমুখী করিবার জন্য শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ যে উপদেশ দিতেন, উহা হইতেছে—"উলট্ যাও"। জয় গুরু।

(২)

আর এক দিনের কথা, শ্রীশ্রীগুরু মহারাজজী বলিলেন,—ভাই প্রমথনাথ! ধীরে ধীরে যাইবার সময় নিকটে আসিতেছে, শীঘ্রই যাইতে হইবে। (মহাপুরুষগণ সময়ে, ভবিষ্যৎ সঙ্কেতের দ্বারা প্রকাশ করেন। সুতরাং পণ্ডিত মহাশয়ের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে তিনি শরীর ত্যাগের সম্বন্ধে সঙ্কেত করিতেছেন।) ইহা শুনিয়া পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, না মহারাজ! আপনার এ কথা আমি শুনিব না। শ্রীশ্রীগুরু মহারাজজী বলিলেন,—ভাই! তুমি কথা শুন আর না শুন, মুহূর্ত্ত যখন উপস্থিত হইবে, সে কি তোমার কথা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিবে? পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—আমার

ইচ্ছা আপনার পূর্ব্বে যাইবার। শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ বলিলেন, তাহা হইবে না। তুমি আমার পরে যাইবে। মৃত্যুর ইচ্ছা করিতে নাই। উহার ইচ্ছা করা মহাপাপ। 'ভগবদিচ্ছা পূর্ণ হউক আমার জীবন মাঝে'—এইরূপ মনোভাব লইয়া প্রার্থনা করিতে হয় বাঁচিবার জন্য। আমরা সন্ধ্যা বন্দনায় প্রার্থনা করি—'পশ্যেম শরদঃ শতঞ্জীমেব শরদঃ শতম্... ইত্যাদি'। প্রাকৃতিক নিয়মে আমারই পূর্ব্বে যাওয়ার কথা। তুমি তো অনেক ছোট। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—মহারাজ! মৃত্যুতে ছোট বড়র বিচার নাই। বড়র সামনেও ছোট চলিয়া যাইতেছে। এমন কোনও প্রাকৃতিক বাঁধা ধরা নিয়ম নাই যে ছোটর পূর্ব্বে বড়ই যাইবে। শ্রীশ্রীগুরু মহারাজজী হাসিতে হাসিতে বলিলেন—তথাপি বড় ইচ্ছা করে ছোটকে রাখিয়া যাইবার। তবে যাইবার জন্য সকলেরই প্রস্তুত হওয়া ভাল। (যাইবার সময় যাহাতে জীব-জগতের কোন আকর্ষণ না থাকে তজ্জন্য বিষয়ে অনাসক্ত থাকিয়া সদা সর্বদা ভগবচ্চিন্তায় মনকে যুক্ত রাখিবার অভ্যাস করিতে হয়।) তদ্দ্বারা অন্তিম সময়ে ভগবদ্ স্মরণের সহায়তা হয় বলিয়া তিনি নিম্নের দোহাটি বলিলেন,—

'বহুত গয়ী থোড়ী রহী, থোড়ী ভী অব জায়।
নট কহতা শুন হে নটী তাল ভঙ্গ ন পায়॥'

পণ্ডিত মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহারাজ! ইহার

তাৎপর্য্য কি? তখন শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ-জীর মধুর সৎসঙ্গ-প্রাবাহ বহিতে আরম্ভ হইল,—তিনি বলিলেন—উক্ত দোহা শুনিয়া কিরূপে এক সময়ে চারিজনের বিবেক জাগিয়া উঠে ও তাহারা কল্যাণ-পথ অবলম্বন করে তাহা বলিতেছি—সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। এক রাজা কৃপণ ছিলেন; যাহাতে খরচ কম হয় তজ্জন্য বিশেষ সাবধান থাকিতেন। একদিন এক বাজীকর রাজ সভায় উপস্থিত হইয়া রাজাকে বলিল, হুজুর! আপনার আজ্ঞা হইলে আমি আপনাকে কিছু বাজী দেখাইতে ইচ্ছা করি। রাজা বলিলেন—আচ্ছা, অন্য কোন দিন হইবে। কিছুদিন পরে পুনরায় বাজীকর আসিয়া বলিল—রাজাসাহেব কাল আমি অন্যত্র যাইব। আজ্ঞা পাইলে আজ বাজী দেখাইতে পারি। অর্থব্যয় আশঙ্কায় রাজা কিছুই বলিতেছেন না অথচ রাজসভার অপরাপর সকলেরই বাজী দেখিবার বিশেষ ইচ্ছা, তজ্জন্য সকলে মিলিয়া রাজাকে বলিল,—মহারাজ! যাহারা বাজী দেখিবে তাহারা সকলে মিলিয়া বাজীকরকে বক্‌শিস দিবে। আপনার খরচ হইবে না, আপনি আজ্ঞা করুন। তখন রাজ-আজ্ঞা পাইয়া সন্ধ্যায় নট ও নটী দুইজনে আসিয়া বাজী দেখাইতে আরম্ভ করিল। রাত্রি অতীত হইতে মাত্র দুই ঘণ্টা বাকী আছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত নট নটী একটি পয়সাও পায় নাই। সেই জন্য নটী হতোৎসাহ হইয়া তাল-মান সহ নটকে বলিল,—

'রাত দো ঘড়ী রহ গয়ী থক্ গয়া পিঞ্জর আজ।
কহে নটী এ বামদেব শুধুই তাল বাজায়॥'

ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—হে বামদেব, সন্ধ্যা হইতে বাজী দেখাইতেছি। আমার দেহ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে আর তুমি কেবল তালই বাজাইতেছ। নটীর দোহা শুনিয়া নট নটীকে পূর্ব্বোক্ত দোহা বলিয়াছিল। উক্ত দোহায় বলিয়াছে—'হে নটী, সমস্ত রাত্রি ব্যতীত হইল আর সামান্যই বাকী আছে, ইহাও শীঘ্রই অতিবাহিত হইবে, সুতরাং তুমি আর এখন তাল ভঙ্গ করিও না।' অর্থাৎ জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মে রত থাকিবে। সে সময় তথায় রাজপুত্র, রাজকন্যা ও এক সাধু বসিয়াছিলেন। সাধুজী উক্ত দোহা শুনিয়া তাঁহার একমাত্র সম্বল কম্বলখানি নটকে প্রদান করিলেন। রাজপুত্র-ও তাঁহার মণিমুক্তা খচিত কেয়ূর এবং রাজকন্যা তাঁহার বহুমূল্য হার নটকে প্রদান করিলেন। ইহা দেখিয়া রাজা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন! মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এ কি ব্যাপার? কেনই বা ইহারা বহুমূল্য অলঙ্কার বাজীকরকে প্রদান করিল? ইহার কারণ জানিতে ঔৎসুক্য হওয়ায় রাজা সাধুজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনার সম্বল কম্বলখানি নটকে প্রদান করিলেন কেন? উত্তরে সাধুজী বলিলেন—রাজাসাহেব! নট আমার প্রভূত উপকার করিয়াছে। দীর্ঘ দিন আমি সাধন ভজনে জীবন

কাটাইয়াছি আর অধিক দিন বাঁচিব না, সময় নিকটে আসিয়াছে কিন্তু আজ আপনার রাজ বৈভব দেখিয়া আমার মনে উদয় হইয়াছিল যে, যদি আমি এইরূপ রাজ্য পাই তাহা হইলে নানাপ্রকার বিষয় সুখ ভোগে শেষ জীবন অতিবাহিত করি। এমন সময় নট উক্ত দোহা বলিল। উহা শুনিয়া আমার ভাবনার পরিবর্ত্তন হইল। আমার মনে হইল—আমি দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছি, সাধন ভজন করিয়াছি। এখন শেষ অবস্থায় যদি মনে ভোগ বাসনা বাসা করে তাহা হইলে সমস্ত জীবনের তপস্যা নষ্ট হইয়া যাইবে। এই রূপ ভাবনা কল্যাণকর নহে। সুতরাং অল্পদিনের জন্য তাল ভঙ্গ না হওয়াই শ্রেয়ঃ। নটের দোহায় আমার বিবেক জাগ্রত হওয়ায় আমি কম্বলখানি দিয়াছি।

অনন্তর রাজা রাজপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি বহুমূল্য অলঙ্কার বাজীকরকে প্রদান করিলে কেন ? রাজপুত্র বলিলেন হে পিতা, যদি আপনি আমায় ক্ষমা করেন তাহা হইলে আমি বলিতে পরি। ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন,—তোমার ভয় নাই তুমি আমার নিকট বল। তখন রাজপুত্র বলিলেন, নট আমাকে মহাপাপ হইতে বাঁচাইয়াছে। আমি যুবাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন আমার কিছু অধিক খরচ হয়। কিন্তু আপনি সমস্ত খরচ দেন না, সেই জন্য আজ আমার মনে উদয় হইয়াছিল যে, আপনাকে হত্যা করিয়া রাজ সিংহাসন

অধিকার করিব ও ইচ্ছানুরূপ রাজত্ব ভোগ করিব। কিন্তু নটের দোহা শুনিয়া আমার হুঁস হইল---আরে! আমার পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন আর বেশী দিন বাঁচিবেন না, কিছুদিন পরে মারিবেনই তখন রাজ্য আমারই হইবে। সুতরাং পিতৃহত্যা করিয়া মহাপাপ করিব না। অল্প দিনের জন্য তাল ভঙ্গ না করাই ভাল। নটের দোহায় আমার এইরূপ শুভ বুদ্ধির উদয় হয়, তজ্জন্য আমি বহুমূল্য কেয়ূর দিয়াছি।

পরে রাজা রাজকন্যাকেও জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি বহুমুল্য হার বাজীকরকে প্রদান করিলে কেন? রাজকন্যা বলিলেন—হে পিতঃ, যদি আপনি আমাকে অভয় দান করেন তাহা হইলে আমি বলিতে পারি। ইহা শ্রবণে রাজা বলিলেন,—তোমার কোন ভয় নাই, তুমি বল। তখন রাজকন্যা বলিলেন, নট আমাকে কলঙ্ক হইতে বাঁচাইয়াছে। আমি যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছি আর আপনি খরচের ভয়ে আমাকে পাত্রস্থ করিতেছেন না। সেই জন্য আমার মনে দুষ্ট ভাবনার উদয় হইয়াছিল যে, আগামীকল্য মন্ত্রীপুত্রের সহিত কুলত্যাগ করিব। কিন্তু নটের দোহা শুনিয়া আমার মোহ ভাঙিল। মনে হইল যে,—পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন। এইরূপ কুকার্য করিলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইবেন। সমাজে তাঁহার দুর্ণাম হইবে, পিতৃকুল কলঙ্কিত হইবে। সুতরাং অল্প দিনের জন্য তালভঙ্গ

করিব না। নটের দোহা শুনিয়া আমি প্রবুদ্ধ হইয়াছি, সেইজন্য বহুমূল্য হার তাহাকে দিয়াছি।

উক্ত তিন জনের বাক্য শ্রবণে রাজারও মোহভঙ্গ হয়। তাঁহার বিবেকোদয় হয়। তিনি বিচার করেন যে, সত্যই তো কিছুদিন পরে আমি মৃত্যুমুখে পতিত হইব। এ ধন কাহার জন্য সংগ্রহ করিতেছি। আমি কৃপণতা করিতেছি কেন? ইহাতে আমার কি লাভ হইবে? পরে রাজা রাজ-কন্যার বিবাহ দিলেন। রাজপুত্রের রাজ্যাভিষেক করিলেন এবং নিজে ভগবদ্ভজনে মনোনিবেশ করিলেন।

দেখ ভাই প্রমথনাথ! নটের একটি দোহায় চারিজনের কল্যাণ হইল। কোন কথায় কাহার হৃদয়ে যে কি ভাবের উদয় হইবে তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। ইহা শুনিয়া পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, মহারাজ! দোহা দুইটি অপূর্ব্ব। আমাকে স্থানে স্থানে বক্তৃতা করিতে হয়, সময়ে ইহার প্রয়োগ করিব বলিয়া দোহা দুইটি লিখিয়া লইলাম। শ্রীশ্রীগুরু মহারাজজী বলিলেন—এই দোহার ভাব আমারও মনেউদয় হয়। নীতিও বলেন, 'অশুভস্য কালহরণম্'।

প্রমথনাথ! তুমি বহুস্থানে বক্তৃতা দাও। একদিন আশ্রমে তোমার বক্তৃতা হউক। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, আপনার নিকট আমি শিশু। আপনার সম্মুখে আমি কি বক্তৃতা করিব। আমি সভায় বক্তৃতা করি, অন্যকে উপদেশ

দিই, অপরকে শুনাই, কিন্তু আমি শুনি না, উপদেশ গ্রহণ করি না। শ্রীশ্রীগুরু মহারাজজী বলিলেন, এ সম্বন্ধেও একটি সুন্দর কথা আছে। উহা বলিতেছি—তুমি সাবধান হইয়া শুন। এক পথিপার্শ্বস্থ বিস্তৃত ময়দানে কোন সুপণ্ডিত বহুদিন যাবৎ ভাগবত-কথা কহিতেছেন। সেই পথ দিয়া এক অশ্বারোহী সিপাহী যাইতেছিল। ময়দানে লোকের সমাবেশ দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে ভাগবতকথা হইতেছে জানিতে পারিয়া উহা শুনিবার জন্য তথায় উপস্থিত হয়েন। কথা প্রসঙ্গে 'ব্রহ্ম সত্য ও জগন্মিথ্যা'র বিষয় অবগত হইয়া বৈরাগ্যের উদয় হয় ও তিনি সাধু হইয়া যান। বহুদিন অতীত হইলে উক্ত সিপাহী সাধুরূপে পুনরায় তথায় আসেন এবং দেখেন যে, সেই পণ্ডিত মহাশয় তখনও ভাগবত কথা কহিতেছেন। ইহা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হন। তিমি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, 'আমি যাঁহার কথা শুনিয়া সাধু হইলাম, তিনি এখনও কথাই কহিতেছেন।' ইহার কারণ অবগত হইবার মানসে তিনি পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি আপনার একটি চাপড় খাইয়া সাধু হইয়াছি আর আপনি বহু চাপড়ের কথা পুনঃ পুনঃ কহিতেছেন তথাপি আপনার বৈরাগ্য উদয় হইতেছে না কেন? পণ্ডিত মহাশয় উত্তরে বলিলেন, 'আপনি কথার সহিত প্রসঙ্গ করিয়াছেন তজ্জন্য আপনি সাধু হইতে পারিয়াছেন কিন্তু আমি অন্যকে কথা

শুনাই মাত্র, নিজে সঙ্গও করি না তজ্জন্য এইরূপ ফল দেখিতে পাইতেছেন।

দেখ প্রমথনাথ! উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের ন্যায় তুমিও প্রতিদিন কত চাপড় খাইতেছ। তোমার চৈতন্যোদয় হওয়া উচিৎ। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, মহারাজ! চৈতন্যময় চৈতন্য না দিলে কি আর চৈতন্যোদয় হইবে? শ্রীশ্রীগুরু মহারাজজী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তবে তোমার চৈতন্য না হওয়া পরমাত্মারই দোষ না কি? পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,— হাঁ মহারাজ! দোষ তাঁহারই। তিনি মায়াকে আশ্রয় দিয়া আমাদিগকে ভুলাইয়া রাখিয়াছেন। বুঝিয়াও বুঝা যায় না, বোকা হইয়া থাকিতে হয়। তাঁহার অপেক্ষা চতুর আর কেহ নাই, তিনি হইতেছেন চতুরের শিরোমণি। (পণ্ডিত মহাশয়ের আকুল প্রাণের বেদনা তাঁহার বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ও নয়নের জলে প্রকাশ পায়। শ্রোতাগণও করুণ ভাব স্পর্শে অভিভূত হইয়া পড়েন) তিান পুনরায় বলিলেন, মহারাজ! আপনাদের সঙ্গ লাভেই আমাদের চৈতন্য হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। শ্রীশ্রীগুরু মহারাজজী বলিলেন, শ্রীভগবান বলিয়াছেন

'ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।'

সংসারেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে যেমন সঙ্গ পায় বা করে সে তেমনই হইয়া যায়। উকীলের সঙ্গ করিলে, উকীলের

ব্যবসায় শুনিতে শুনিতে উকীলী বুদ্ধি হইয়া পড়ে। ব্যবসায়ীর সঙ্গ করিয়া—বাণিজ্য-বুদ্ধি লাভ হয়। ধার্ম্মিকের সঙ্গ লাভে ধর্ম্মবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মহতের কৃপালাভে শুদ্ধ চৈতন্যের উদয় হয়।

ইহা শুনিয়া পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, 'মহাপুরুষগণের নিকট ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কিছুই থাকে না। তাঁহারা সর্ব্বদা ঈশ্বরের নাম, রূপ, গুণ ও মহিমা কীর্ত্তনে রত থাকেন।' তাঁহাদের সান্নিধ্যে আসিলে উহা শুনিতে শুনিতে ঈশ্বরভাবে হৃদয় ভরিয়া উঠে। দুইদিন যাবৎ আপনার সান্নিধ্যে রহিয়াছি। সদা সর্ব্বদা আপনার শ্রীমুখ হইতে ঈশ্বরের অনন্ত মহিমার কথাই শুনিতেছি। যদিও আপনাকে আশ্রম পরিচালনায় নানাপ্রকার ব্যবহার করিতে হয়, তথাপি এই ব্যবহারের মূলে রাখিয়াছেন ঈশ্বরকে। সেইজন্য সংসার চক্রের মধ্যেও ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা আপনার নিকট প্রকাশ পায়। আপনার ভাবনাই ঈশ্বরময়, সেইজন্য আপনার সান্নিধ্যে আসিলে এক দিব্য ভাব অন্তরকে স্পর্শ করে। গোস্বামীজী বলিয়াছেন—

"তাত স্বর্গ অপবর্গ সুখ ধরিঅ তুলা এক অঙ্গ।
তুল ন তাহি সকল মিলি জো সুখ লব সৎসঙ্গ॥"

তিনি পুনরায় বলিলেন,—সঙ্গ দুই প্রকার। একটি সঙ্গ—অপরটি প্রসঙ্গ। সঙ্গ হইতেছে— যেমন খুব গরম বোধ

হইতেছে, ঠাণ্ডা জলে স্নান করায় শরীর ঠাণ্ডা হইল। কিন্তু উহা সাময়িক, পুনরায় গরম বোধ হয়। সেইরূপ আমরা সংসার তাপে তাপিত। আপনার সান্নিধ্যে, আপনার উপদেশে ক্ষণিক শীতলতা অনুভব করি, কিন্তু এ স্থান ত্যাগ করিলে পুনরায় আমাদের তাপ উপস্থিত হয়। আর প্রসঙ্গ হইতেছে যেমন মহিষের গরম বোধ হইলে সে পুষ্করিণীর জলে নামিয়া বসিয়া থাকে, কিছুতেই জল হইতে উঠিতে চাহে না, অগত্যা উঠিতে হইলে পুষ্করিণীর কাদামাটী শরীরে মাখিয়া লয়, সেজন্য শরীর ঠাণ্ডা থাকে, গরম বোধ হয় না এবং মাছি মশাও কামড়াইতে পারে না। সেইরূপ আমরা যদি আপনার প্রসঙ্গ করি অর্থাৎ আপনার সদ্ভাব, আপনার উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করি, তাহা হইলে এস্থান ত্যাগ করিলেও সংসার তাপ আমাদিগকে তাপিত করিতে পারিবে না। সঙ্গ করিলে ক্ষণিক শান্তি হয় আর প্রসঙ্গ লাভে শান্তি চিরস্থায়ী হয়। ইহা শুনিয়া শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজী বলিলেন, তুমি শাস্ত্রজ্ঞ, তোমাকে অধিক কিছু বলিবার নাই, সঙ্কেতই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। তুমি সংসারাভিমুখী বৃত্তিকে উল্টাইয়া ঈশ্বরাভিমুখী করিয়া লও। তাহা হইলে শান্তি স্থায়ী হইবে। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, মহারাজ! আপনি আমাদের কল্যাণের জন্য কত কষ্ট স্বীকার করেন। কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া আপনি উপদেশ করিতেছেন। সেই জন্যই কাক ভূশুণ্ডি বলিয়াছেন—

'পর উপকার বচন মনকায়া, সন্ত সহজ সুভাউখগরায়া।
সন্ত উদয়সন্তত সুখকারী, বিশ্ব সুখদ জিমি ইন্দু তমারী॥'

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজী বলিলেন,—হাঁ ভাই! আমি উকীল, ডাক্তারদের বলি তোমরা এত সময় পরিশ্রম করিলে কত টাকা লইতে। আমাকে তোমরা পারিশ্রমিক দাও। আমার পারিশ্রমিক কি জান? তোমরা যদি আমার উপদেশ হৃদয়ে ধারণ কর, আমার শিক্ষানুরূপ আচরণ কর ও তদ্দ্বারা তোমাদের কল্যাণ হয় তাহা হইলে আমার শ্রম সার্থক হইবে! সার্থক শ্রমই আমার পারিশ্রমিক। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—আপনি সৎসঙ্গের মধ্য দিয়া সকলের কল্যাণ-কামনায় দয়া বর্ষণ করিতেছেন। তখন শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজী তাঁহার প্রিয় দোহা আবৃত্তি করিলেন—

'দয়া ধরম কা মূল হ্যায়, পাপ মূল অভিমান।
তুলসী দয়া ন ছোড়িয়ে, যব লগ্ ঘটমে প্রাণ॥'

বলিলেল,—অন্তকরণে দয়া থাকিলে ধর্ম্মাচরণের সহায়ক হয়। ক্রমশঃ আসুর ভাব নষ্ট হইয়া দৈব ভাব জাগে। অভিমান বহু অনিষ্ট সাধন করে, তজ্জন্য উহা ত্যাগ করিয়া আমৃত্যু দয়ার উপাসনা করিবে। জয় গুরু।

(৩)

একদিন সৎসঙ্গী সভায় জনৈক শ্রোতা 'সংসারের শ্রেষ্ঠ বস্তু' লইয়া আলোচনা উঠাইলেন। অনেকেই অনেক কিছু বলিলেন। অনন্তর সভাস্থ সকলে শ্রীশ্রীগুরু মহারাজজীর শ্রীমুখ হইতে এ সম্বন্ধে উপদেশ পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, মৃদু হাস্যে তিনি বলিলেন—"মনুষ্য শরীরেই জীব মুক্ত হইতে পারে, যাহা বুদ্ধিগম্য জ্ঞানের চরম ও পরম ফল"; কিন্তু (মনুষ্য শরীর না বলিয়া মনুষ্য জীবন বলাই যুক্তিযুক্ত) কারণ মনুষ্য শরীরধারীর মধ্যে অনেক পশু-প্রবৃত্তির জীবন আছে, পরন্তু সে জীবনে মনুষ্য-শরীর পাইয়াও মুক্ত হওয়া যায় না। যেহেতু মনুষ্য জীবন মনুষ্য-শরীরেই লাভ করা যায়, সেই হেতু শাস্ত্রে মনুষ্য দেহেরই বর্ণনা পাওয়া যায়। দেখাও যায়—জীব জীবনের চরম ও পরম ফল 'তত্ত্বজ্ঞান' ছাড়া, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ-বোধ বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান প্রাণীমাত্রেরই আছে। (তত্ত্বজ্ঞান ও বিষয় জ্ঞান দুইটি পৃথক বস্তু। বিষয়জ্ঞানে মোহ নিবৃত্তি না হইয়া বরং বৃদ্ধি পায় আর একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানেই মোহ নিবৃত্তি হয়।) সাধারণ অবস্থায় বিষয়জ্ঞানে যদি মোহ নিবৃত্তি হইত, তাহা হইলে সকল প্রাণীরই অনায়াসে মুক্তি হইত। সেইজন্য মনুষ্য জীবনে শুধু জৈবী এষণাই (আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ) সব কিছু নয়, ইহাতো পশু জীবনেও আছে। সুতরাং জৈবী এষণাগুলিকে মনুষ্য জীবনের ধারায় এমন ছাঁচে ফেলিয়া লইতে

হইবে, যাহাতে উহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভের পরিপন্থী না হইয়া সেই আনন্দময়েরই স্বরূপ সন্ধানের পরিপোষকরূপে সহায়ক হইতে পারে। এ সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন—ভগবানের সহিত যুক্ত থাকিয়া ত্যাগ পূর্বক (সংযমের সহিত) ভোগ কর 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা' এবং গীতাও বলেন—রাগদ্বেষমুক্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা যথা প্রাপ্ত বিষয় সেবনে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির চিত্ত-প্রসাদ লাভ হয় এবং উহার ফলে আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখের নির্ব্বৃত্তি হওয়ায় তাহার শীঘ্র ব্রহ্মদর্শিনী বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়—

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥
প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে॥

গীতা ২।৬৪-৬৫

যদিও প্রাথমিক অবস্থায় ইহা বাহ্যতঃ বিরুদ্ধ মত দেখায়, কিন্তু আসলে ইহা মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া স্বয়ং সম্পূর্ণ। সুতরাং বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ লইয়া মনুষ্য জীবনের সহিত পশু জীবনের পার্থক্য। মনুষ্য জীবনে আছে বুদ্ধিবৃত্তির নির্দ্দেশ আর পশু জীবনে থাকে প্রবৃত্তির তাগাদা, ইহাই সৃষ্টির বিধান ও জীব প্রকৃতির সার কথা। মানুষই আশ্রম ও সমাজধর্ম্ম গড়িয়াছে, ইহা বিচার বুদ্ধির প্রখরতা ও অভিজ্ঞতার প্রতিষ্ঠা। এই অবস্থা

হইতেই কল্যাণ বুদ্ধির আশ্রয়ে মানুষ যে চরম বিকাশে উপনীত হয়—উহাই মনুষ্যত্ব, যাহার অপর নাম দিব্যজীবন। এই অবস্থায় সে সকল অনৈক্যের মধ্যে পায় এক ঐক্যের সন্ধান, যাহা গীতার ভাষায় 'সাত্ত্বিক জ্ঞান' নামে অভিহিত (১৮।২০); বক্ষ্যমাণ-জ্ঞানে পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়।

অনন্ত লোক ও যোনি ভ্রমণের পর জীব এই অপূর্ব্ব মনুষ্য শরীর পায়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

(১১। ২০। ১৭)

মনুষ্য শরীর অন্য সমস্ত জীব-দেহ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং ইহা সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতার পক্ষে সহজলভ্য হইলেও দুষ্কর্ম্মানুষ্ঠাতার পক্ষে পরম দুষ্প্রাপ্য। জন্ম-মৃত্যু-রূপ সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায়ভূত সুন্দর ও সুদৃঢ় ভেলাস্বরূপ এই মনুষ্য শরীর শ্রীভগবানের কৃপায় লাভ হয়। এই অপূর্ব্ব শরীর লাভ করিয়া শ্রীগুরুর শরণ লইবা মাত্র তিনি ইহার কর্ণধার হয়েন এবং শ্রীভগবানের নাম স্মরণ করিবামাত্র তিনি অনুকূল বেগ প্রদানে লক্ষ্যের দিকে আগাইয়া দেন। সুতরাং এরূপ সুবর্ণ সুযোগ লাভ করিয়াও যে বর্ত্তমান জীবনেই সংসার-সাগর উত্তীর্ণ না

হয়, অপর পক্ষে কাম উপভোগই জীবনের পরম লক্ষ্য জ্ঞানে বিষয়ে আসক্ত হয় এবং কামনার বশীভূত হইয়া যে কোন উপায়ে বিষয় সংগ্রহ ও কেবল উহার উপভোগে সময় নষ্ট করে; প্রকৃত প্রস্তাবে সে নিজের বিনাশই সাধন করে।) কেন না— এবম্প্রকার অধঃপতনশীল মনুষ্য কেবল জীবনকেই ব্যর্থ ও নষ্ট করে না বরং তাহারা কর্ম্মবন্ধনরূপ শৃঙ্খলকে আরও দৃঢ়ীভূত করে। এইরূপ ভোগপরায়ণ মনুষ্য তিনি রাজাই হউন বা ফকিরই হউন, যদিও সংসারে সে বিশাল নাম, যশ, বৈভব অথবা অধিকার প্রাপ্ত হয়েন তথাপি মৃত্যুর পরে উক্ত কর্ম্মের ফলস্বরূপ তাহাকে পুনঃ পুনঃ বিভিন্ন শোক ও সন্তাপপূর্ণ পশু, পক্ষী ও কীটাদি যোনিতে তথা ভয়ানক নরকে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে হয়। অতএব যাহাতে এ সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট না হয়, তজ্জন্য মনুষ্যের তৎপ্রতি সার্থক যত্নশীল হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য, সেইজন্য শ্রীগীতা বলিয়াছেন—

"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ" (৬।৫)

একই প্রকার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করিয়াও শ্রদ্ধাহীন মনুষ্য কেনই বা অন্ধের ন্যায় অশেষ দুঃখ পায় এবং শ্রদ্ধাশীল মনুষ্য কি প্রকারেই বা দুঃখ সাগর নিঃশেষে পার হইয়া যায় তৎসম্বন্ধে একটি উদাহরণ আছে ; উহা নিম্ন প্রকার—

পুরাকালে কোন এক রাজ্যের রাজধানী উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত ছিল ও উহার বাহিরে যাইবার একটি মাত্র দুয়ার ছিল।

(সেইরূপ ভগবানময় এই সংসারই উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত রাজধানী ও ইহার বাহিরে যাইবার একমাত্র দরজা হইতেছে 'মোক্ষদ্বার'।) এক সময় রাজ্যে দুইটি অন্ধ গ্রামীণ অন্নজল অভাবে কষ্টে পতিত হয়। কষ্ট লাঘব করিবার আশা লইয়া, রাজধানীতে প্রচুর অন্নজল পাইব মনে করিয়া তথায় আসে; কিন্তু হয় উহার বিপরীত। তাহারা অন্ধ, দেখিতে পায় না। (সেইরূপ মায়ামুগ্ধ মনুষ্যও দেখিতে পায় না।) এদিকে রাজধানীর রাস্তা-ঘাট যানবাহন ও লোকজনে ভরা; সুতরাং তাহারা যেদিকে যায় ধাক্কা খায়, পড়ে যায় ও আঘাত পায়। (সেইরূপ মনুষ্যের জীবন-পথও নানা লোভনীয় বিষয়রূপ কণ্টকে পরিপূর্ণ।) সুতরাং তাহারা (অন্ধদ্বয়) রাজধানীতে আসিয়া অধিকতর দুঃখে পতিত হইল। (মনুষ্যও তেমনই মনোমুগ্ধকর শব্দাদি বিষয়রস আস্বাদনে বিবেক খোয়াইয়া নানারূপ দুঃখে নিমগ্ন হয়।) অবশেষে অন্ধদ্বয় পুনরায় গ্রামে ফিরিয়া যাইতে মনস্থ করে। (সেইরূপ যথা সময়ে মনুষ্যেরও মুক্ত হইবার শুভ ইচ্ছা জাগে।) অনন্তর কোনও সুকৃতির ফলে অন্ধদ্বয় এক দয়ালু ব্যক্তির সংস্পর্শে আসে এবং তাহারা কাতর কণ্ঠে তাঁহাকে রাজধানীর বাহিরে যাইবার পথ দেখাইয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করে। (তেমনই সৌভাগ্যবশে মনুষ্যও সদ্‌গুরু লাভ করে এবং তাঁহার শরণাপন্ন হয়।) তখন উক্ত দয়ালু ব্যক্তি অন্ধদ্বয়ের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া বলেন—এস, তোমরা অন্ধ, তোমাদের

পথ ধরাইয়া দিই এবং কি ভাবে রাজধানীর একমাত্র দুয়ার দিয়া বাহির হওয়া যাইবে, তাহা শোন বলিয়া,—অন্ধদ্বয়কে প্রাচীর ধরাইয়া দিয়া বলিলেন—এই প্রাচীর ধরিয়া বরাবর যাইয়া যেখানে প্রাচীর শেষ হইয়া ফাঁক পাইবে, জানিবে উহাই রাজধানীর দুয়ার। তখন সেই দুয়ার দিয়া রাজধানীর বাহিরে চলিয়া যাইবে। কিন্তু যদি অনবধানতা বশতঃ প্রাচীর ছাড়িয়া দাও বা দুয়ার অতিক্রম করিয়া যাও, তাহা হইলে পুনরায় রাজধানীর নানা দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। সুতরাং আমার কথা মনে রাখিও ভুলিও না, বলিয়া—তিনি প্রস্থান করিলেন।

(সেইরূপ ভাবে শরণাগত বিবেকহীন মনুষ্যকেও গর্ভ, জন্ম, ব্যাধি, জরাও মরণরূপ দুঃখপূর্ণ মহাভয়প্রদ সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ করিবার জন্য সদ্‌গুরু কৃপা করিয়া নানা সদুপদেশ ও সাধন দেন।) অনন্তর অন্ধদ্বয় দয়ালু ব্যক্তির উপদেশ সহায়ে প্রাচীর ধরিয়া চলিতে থাকে। কিন্তু দীর্ঘপথ অতিক্রম করিবার পর তাহাদের শরীরস্থিত দাদ চুলকাইয়া উঠে, তখন তাহাদের মধ্যে সংস্কারহীন অন্ধটি প্রাচীর ছাড়িয়া দিয়া দুই হাতে দাদ চুলকাইতে চুলকাইতে চলিতে থাকে, ইত্যবসরে রাজধানীর দুয়ার পার হইয়া যায়; সুতরাং সে রাজধানীর বাহিরে যাইতে না পারিয়া পুনরায় রাজধানীর মধ্যে নানা দুঃখ কষ্টে পতিত হয়। (তেমনই উক্ত অন্ধের ন্যায়

(শ্রদ্ধাহীন মনুষ্যও সদ্‌গুরুর নিকট হইতে সাধন ও উপদেশ লাভ করিয়া জীবন-পথে চলিতে থাকে। কিন্তু তুর্ভাগ্যবশতঃ দীর্ঘ সময় ও পথ অতিক্রান্ত করিয়াও সূক্ষ্ম শরীরস্থিত কাম, ক্রোধ ও লোভাদির বশবর্ত্তী মনুষ্য ঐন্দ্রিয়ক বিষয়রসে মুগ্ধ হইয়া সদগুরুর উপদেশ ভুলিয়া যায় এবং সাধনচ্যুত হইয়া এ শরীরে আর সংসার তুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারে না) সুতরাং তাহাকে সাংসারিক তুঃখরূপ আবর্ত্তনে নিমজ্জিত হইতে হয়।) অপর পক্ষে কিঞ্চিৎ সংস্কারযুক্ত দ্বিতীয় অন্ধটি, দয়ালু ব্যক্তির উপদেশমত প্রাচীর ধরিয়া চলে এবং তাহার দেহস্থিত দাদ চুলকাইলেও সে প্রাচীরের হাত ছাড়ে না এবং অন্যহাতে দাদ্ চুলকায় ও রাজধানীর তুয়ার আসিবামাত্র উক্ত তুয়ার হইয়া রাজধানীর বাহির হইয়া পড়ে এবং গ্রামে যাইয়া নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে অবস্থান করতঃ সুখী হয়। (তেমনই দ্বিতীয় অন্ধের ন্যায় শ্রদ্ধাশীল মনুষ্যই সদ্‌গুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত সাধন ও সতুপদেশ আদরপূর্ব্বক ধারণ করিয়া জীবনপথে চলে এবং দীর্ঘ সময় ও পথ অতিক্রান্ত করিবার কালে সাধননিষ্ঠ থাকায়, তাঁহার সূক্ষ্ম শরীরস্থিত কাম, ক্রোধ লোভাদি তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না, তজ্জন্য সে ইহ জীবনেই সংসার হইতে মুক্ত হইয়া যায়।))

উক্ত প্রকারে তোমরাও শ্রদ্ধাশীল হইয়া "এক হাতে ভগবানকে ধরিয়া থাক ও অন্য হাতে সংসার কর।" পুনরায়

বলিলেন, জানিবে—এই অখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু তোমাদের ইন্দ্রিয়গোচরীভূত চরাচরাত্মক জগৎ এবং ইন্দ্রিয়াগোচরীভূত সমস্ত পদার্থ রহিয়াছে, উহা সমস্তই সেই সর্ব্বাধার. সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বাধিপতি, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকল্যাণগুণস্বরূপ পরমেশ্বরের দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে—'ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'। ইহার কোনও অংশে তিনি নাই এমন নহে—তিনি কার্য্য, কারণ ও কর্ত্তারূপে সর্ব্বত্র বিরাজমান। এইরূপ বুদ্ধি যোগের দ্বারা শ্রীভগবানকে নিরন্তর হৃদয়ে রাখিয়া সদা সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণ করিতে করিতে ইহ জগতে অনাসক্ত হইয়া, কেবল কর্ত্তব্য পালনের জন্যই যথাপ্রাপ্ত শব্দাদি বিষয়কে যথাবিধি ভোগ কর অর্থাৎ যজ্ঞার্থ বিশ্বরূপ ভগবানের পূজার জন্যই কর্ম্মের আচরণ হউক —'স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য'। বিষয়ে মনকে আবদ্ধ না রাখিলে নিশ্চিতই কল্যাণলাভ হয়। বস্তুতঃ এই ভোগ্য পদার্থ কাহারও নহে। মনুষ্য ভ্রমে পড়িয়াই এই ভোগ্যবস্তুর প্রতি আসক্ত হয়। এ সবই ভগবানের এবং তাঁহার জন্যই ইহাকে ব্যবহার করিতে হইবে।

অতএব সমস্ত জগতের একমাত্র কর্ত্তা, ধর্ত্তা, হর্ত্তা ও সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বময় শ্রীভগবানকে সতত স্মরণ-পথে রাখিয়া সব কিছু তাঁহারই জানিয়া তাঁহারই পূজার আয়োজনে শাস্ত্র-নিয়ত কর্ত্তব্য কর্ম্মের আচরণ দ্বারা জীবন ধারণের ইচ্ছা

রাখ। এবম্প্রকারে নিজ জীবনকে ভগবানের শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়া দাও। ইহাই কেবল মনে রাখ যে শাস্ত্রোক্ত স্বকর্ম্মের আচরণ করিয়া জীবন যাপন করা কেবল যজ্ঞার্থ,—শ্রীভগবানের পূজার জন্য, নিজের উপভোগ জন্য নহে। তাহা হইলে যথাসময়ে শ্রীভগবানের কৃপায় তত্ত্বজ্ঞান লাভে মনুষ্য জন্ম সার্থক হয়। শ্রীগীতা বলেন :—

'সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যাপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥ ১৮।৫৬

'জয়গুরু'

(৪)

শ্রীশ্রীগুরু মহারাজজীর জনৈক প্রিয় শিষ্য ভক্তিভরে তাঁহার শ্রীচরণ কমলে প্রণাম করিবার পর শ্রীশ্রীগুরু মহারাজজী তাহাকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—বাছা, তোমার শরীর এত দুর্ব্বল হইল কেন? তদুত্তরে শিষ্য কাতর স্বরে জানাইলেন যে মহারাজ, আমার মনে হয় সংসার ছাড়িয়া যাইবার সময় আসন্ন, তাই আপনার শরণে আসিয়াছি। এখন অন্তিম সময়ে যাহাতে আপনার অভয়প্রদ শ্রীচরণে দৃঢ় ভক্তি থাকে এই আশীর্ব্বাদ করুন। ভক্তের করুণ প্রার্থনায় শ্রীশ্রীগুরুমহারাজী বলিলেন,—বাছা, তাহাই হইবে; কিন্তু তুমি

এরূপ নিরাশ হইও না, মনে বল রাখিও। তখন শিষ্য সাশ্রুনয়নে কহিলেন—হে ধর্ম্ম-পিতঃ, আমাকে ভুলাইয়া রাখিবেন না। যাহাতে আমার উত্তম গতি হয় এই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। অনন্তর শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজী তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন,—বাছা, সেই ভগবদ্বাণী স্মরণ কর—

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ গীতা ৮।৫

ইহার জন্য 'সদা তদ্ভাবভাবিতঃ' হইতে হয় এবং অন্তিম সময়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকিতে হয়। কারণ সারা জীবনের পরীক্ষা হয় এই সময়ে এবং এই জন্যই সমস্ত জীবনের শুভানুষ্ঠান। কিন্তু যাহারা শুভানুষ্ঠান বা সাধন ভজন করে না তাহাদের কথা ছাড়িয়া দাও, এমন কি উত্তম ভজনশীল ও শুভানুষ্ঠানকারীগণেরও মৃত্যু-যন্ত্রণার মধ্যে ভগবদ্‌কৃপা ভিন্ন তাঁহাতে মতি স্থির রাখা কঠিন হইয়া পড়ে। বাছা, এই অন্তিম সময়কার অন্তরায় সম্বন্ধে একটি কাহিনী কহিব; উহার দ্বারা তোমার সম্যকরূপে বোধগম্য হইবে যে, জীবনে কিরূপ সাধনা হইলে তবে অন্তকালে ভগবদ্ভাবে চিত্ত তন্ময় হইতে পারে।

অতীত সময়ে এক গ্রামে জনৈক সদাচারনিষ্ঠ দরিদ্র ব্রাহ্মণ দম্পতি বাস করিতেন। তাঁহাদের কোন সন্তান না হওয়ায় তাঁহারা দুঃখিত ছিলেন। পরে অধিক বয়সে তাঁহারা একটি কন্যারত্ন লাভ করেন। ইহাতে তাঁহারা উভয়েই বিশেষ

আনন্দিত হইলেন এবং সযত্নে সেই কন্যারত্নকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। কন্যার বালিকা অবস্থাতেই সাত্ত্বিক ভাব পরিলক্ষিত হয়। বালিকা কিছু বড় হইয়াই মাতা পিতার ন্যায় প্রাতঃকালে বাগান হইতে পুষ্পাদি চয়ন করতঃ শৌচ ও স্নান সারিয়া তদ্দ্বারা দেবাদিদেব মহাদেবের পূজায় সমস্ত দিন কাটাইয়া দিত। সন্ধ্যায় সামান্য কিছু আহার করিয়া সন্তুষ্ট থাকিত। কন্যা ক্রমশঃ কিশোরী অবস্থা প্রাপ্ত হইলে মাতা পিতা তাহাকে পাত্রস্থ করিবার জন্য চিন্তাকূল হইয়া পড়িলেন। কন্যা মাতা পিতার উদ্বেগভাব লক্ষ্য করিয়া বলিলেন— আপনারা আমার বিবাহ জন্য উদ্বিগ্ন হইবেন না, আমি কুমারী থাকিব; বিবাহ করিব না। যদি আপনারা জোর করিয়া আমার বিবাহ দেন তাহা হইলে আমার শরীর নষ্ট হইবে, আমি জীবিত থাকিব না। কন্যার এইরূপ কঠোর বচন শুনিয়া মাতা পিতা ভীত হইলেন এবং কন্যার বিবাহের ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন।

এদিকে কন্যা অধিক সময় ভজন পূজনে অতিবাহিত করিতে লাগিল। বহুকাল পরে কন্যারত্ন অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কন্যার প্রাণবায়ু উৎক্রমণ-কালে তাহার সুপ্ত কামনার উদয় হয় যে, আমি দরিদ্র-কন্যা হওয়ায় সমস্ত জীবন কেবল ভজন পূজনেই কাটাইলাম। আমি ধনসম্পদের সুখ পাইলাম না। কন্যা যখন উক্ত ভাবের জাল বুনিতেছিল

সেই সময়ই তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়। (মৃত্যুকালে মনোমধ্যে যে ভাব হয় সে পর জন্মে তাহাই পায়—)

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয়······················গীতা-৮।৬

সুতরাং উক্ত নিয়ম বশে কন্যা পরজন্মে এক অপুত্রক রাজগৃহে জন্মগ্রহণ করে এবং পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য প্রভাবে ইহ জন্মে জাতিস্মর হয়। সুতরাং পূর্ব্ব জন্মের সমস্ত বৃত্তান্ত রাজকন্যার মনে থাকায় সে মনে মনে বিচার করিতে থাকে যে, গতজন্মে মরণ কালে আমি সতর্ক না থাকায় আমার যাবতীয় পুণ্যকর্ম্ম কোন কাজেই আসে নাই এবং আমাকে অন্তিম বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া আবার এই জরা-মরণ-শীল দেহ ধারণ করিতে হইল। অতএব এজন্মে মরণকালেও আমাকে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। মৃত্যুকালে যদি ইষ্টদেবতার স্মরণ করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ হয় তাহা হইলে আর আমাকে এই পাপতাপময় সংসারে নশ্বর শরীরে আসিতে হইবে না।

উক্তরূপ চিন্তার প্রভাবে রাজকন্যা বড় হইয়া যাহাতে চিত্ত বিষয়াকৃষ্ট না হয় তজ্জন্য উত্তম ভোগসমূহ ত্যাগ করিয়া দিন রাত কেবল শ্রীভগবানের পূজা ও নানারূপ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকে। এদিকে রাজা নিজ বিশাল রাজ্যের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিণী একমাত্র কন্যার বিষয়-বিমুখতা দর্শনে চিন্তিত হইলেন এবং মন্ত্রির নিকট পরামর্শ করিয়া স্থির হইল যে

রাজকুমারী পাত্রস্থ হইলে তাহার এভাবের পরিবর্ত্তন হইতে পারে। তজ্জন্য রাজা কাল বিলম্ব না করিয়া রাজকুমারীর বিবাহের আয়োজনে মনোনিবেশ করিলেন।

কিন্তু রাজকুমারী নিজ বিবাহের কথা অবগত হইয়া পিতাকে জানাইল যে, আপনি আমার বিবাহের কোনও আয়োজন করিবেন না। আমি বিবাহ করিব না। কারণ বিবাহ হইলেই আমার মৃত্যু হইবে। রাজকন্যার এবম্বিধ কথা শ্রবণে রাজা ভয় পাইলেন এবং কন্যার বিবাহ স্থগিত রাখিলেন।

অনন্তর কিছু কাল পরে রাজকুমারী অসুস্থ হয়। রাজা কন্যার চিকিৎসার জন্য বৈদ্য আনাইতে বলায় কন্যা বলিল—হে পিতঃ, বৈদ্য আনাইবেন না। কারণ বৈদ্য আমাকে স্পর্শ করিলেই হয়ত আমার মৃত্যু হইতে পারে। কিন্তু ভাবি যাহা তাহা হইয়াই থাকে বলিয়া,—রাজা কন্যার বাক্য উপেক্ষা করতঃ বৈদ্যকে ডাকাইলেন এবং রাজকুমারীর চিকিৎসা করিবার আজ্ঞা দিলেন। বৈদ্য রাজাজ্ঞা পাইয়া রাজকুমারীর নাড়ী দেখিবার কালে হস্ত স্পর্শ করায় কন্যার মনোভাব পরিবর্ত্তন হয়। তখন কন্যার মনোমধ্যে উদিত হয় যে, আমার দুইবার নারীজন্ম হইল; কিন্তু পুরুষ-সুখ হইতে বঞ্চিত থাকিলাম। রাজকুমারী যখন এই ভাবনায় মগ্ন ছিল সেই সময় তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়। সুতরাং ভগবৎ-নিয়মবশে সেই রাজকন্যা পর জন্মে এক

বেশ্যাকন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। যদ্যপি সে বেশ্যাকন্যা হইল বটে, কিন্তু পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলে এজন্মেও সে জাতিস্মর হইল। সুতরাং তাহার পূর্ব্ব জন্মের সমস্ত বৃত্তান্ত মনে পড়ায় অত্যন্ত দুঃখিত অন্তঃকরণে চিন্তারত হইল যে—'গত জন্মে প্রাণত্যাগ সময়ে অসাবধান থাকায় মনে পুরুষ-সুখের উদয়ে আমার সুদীর্ঘ কালের ভজন-পূজন ও সৎকর্ম্ম ব্যর্থ হইয়াছে এবং আমাকে এই সমাজের ঘৃণিত বেশ্যাকন্যা-রূপে জন্ম লইতে হইয়াছে। এখন এই পরিস্থিতির মধ্যে কি উপায়ে আমার ধর্ম্ম রক্ষা হইবে জানি না।'

পরে সেই বেশ্যাকন্যা বড় হইয়াই নিজধর্ম্ম রক্ষার জন্য পাগলীর মতন আচরণ করিতে লাগিল। সেই কন্যা শরীরে ধূলাকাদা মাখিয়া থাকিত। যেখানে সেখানে নোংড়া জায়গায় অবস্থান করিত। কেহ নিকটে আসিলে গালাগালি দিত। এইভাবে অবস্থান করার জন্য সেই বেশ্যাকন্যা যুবতী অবস্থায় নিজ ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া সাধন ভজনে নিযুক্ত থাকিতে সমর্থ হয়। পাগলী যখন গঙ্গাস্নানে আসিত, তখন গঙ্গাতীরে এক সাধুকে দেখিয়া সহাস্যে নিম্ন-লিখিত প্রবাদবাক্য শুনাইত—

"তপা সো খপা, অন্তমতা সো গতা"

অর্থাৎ—তপস্যা পিছনে পড়িয়া থাকে আর অন্তিম সময়ের ভাবনানুযায়ী গতি হয়।

বাঙলায়ও বলে—'জপ তপ কর কি মরণ হুঁসিয়ার।'

সেই পাগলী প্রায়ই গঙ্গাস্নানান্তে সেই সাধুকে উক্ত প্রবাদবাক্য শুনাইয়া চলিয়া যাইত। সে সময়ে সাধু বুঝিতে পারেন নাই যে, পাগলী সাধননিষ্ঠ ও জাতিস্মর। সাধু ভাবিয়াছিলেন যে, ইহার মাথা খারাপ তাই যা তা বলিয়া থাকে। এদিকে কোন সময়ে সেই সাধুর এক চর্ম্মকার ভক্ত তাঁহার ব্যবহারের জন্য একজোড়া পাদুকা লইয়া আসে এবং বিনম্র বচনে উহা ধারণ করিয়া তাহার শ্রম সার্থক করিবার জন্য প্রার্থনা জানায়। সুতরাং তিনি ভক্তের বিশেষ আগ্রহ জন্য উহা সময়ে ধারণ করিবেন বলিয়া পাদুকা রাখিয়া দেন। কিছুদিন পরে সেই সাধু অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং তাঁহার প্রাণ বিয়োগ-কালে হঠাৎ সেই চর্ম্মকারের কথা মনে হয়। অতএব মৃত্যুকালের ভাবনায় তাহার চর্ম্মকার গৃহে জন্ম হয়। যদিও চর্ম্মকার গৃহে জন্ম হইল তথাপি তপস্যার পুণ্য প্রভাবে জাতিস্মর হইল। তখন সেই জাতিস্মর চর্ম্মকার বালক গত জন্মের মৃত্যুকালীন অসাবধানতার কথা ভাবিয়া যারপর নাই দুঃখিত হয় এবং ইহ জন্মে এই চর্ম্মকার গৃহে ধর্ম্ম-রক্ষা সহজ নহে বিবেচনায় মাতৃস্তন্য পানে বিরত থাকে। শিশু স্তন্য পান করিতেছে না শুনিয়া পাড়ার অনেকে অনেক রকম টোট্‌কা করিল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে এক বৃদ্ধা সেই পাগলীকে আনাইয়া ঝাড়্ ফুক্ করাইবার পরামর্শ দেওয়ায়, সেই শিশুর পিতা পাগলীকে আনাইয়া

সকল কথা বলায়—পাগলী, সেই শিশুকে দেখে আর হাসে। পরে শিশুর মাতাকে বলে যে—শিশুকে আমার কোলে দাও আর তুমি কিছুক্ষণের জন্য বাড়ীর বাহিরে যাও। আমি ঝাড়্ ফুক্ করিলে শিশু ভাল হইবে এবং স্তন্যদুগ্ধও পান করিবে। তখন বালকের মাতা শিশুকে পাগলীর কোলে দিয়া বাটীর বাহিরে গেলেন। এদিকে পাগলী শিশুকে কোলে করিয়া হাসিতেছে আর বলিতেছে—

'তপা—সো—খপা—অন্তমতা-সো-গতা।'

আর বলিল—ভাই সাধুজী! তোমার পূর্ব্বজন্মে গঙ্গাতীরে আমি তোমাকে এই প্রবাদবাক্য বলিয়া প্রায়ই সতর্ক থাকিবার ইঙ্গিত করিতাম। কিন্তু তথাপি তুমি মৃত্যুকালে সতর্ক থাকিতে পার নাই। যেরূপে তোমার দুই জন্ম অতীত হইল সেইরূপে আমারও দুই জন্ম অতীত হইয়াছে বলিয়া নিজ দুই জন্মের সমস্ত কথা সেই বালককে শুনাইল এবং এ জন্মে বিশেষ সাবধান থাকিতে বলিল।

আরও বলিল—কোন অপরাধীর জেল হইলে যদি সে স্বইচ্ছায় জেল ভাঙ্গিয়া পলায়ন করে, তাহা হইলে রাজা তাহার অধিক দণ্ডের বিধান করেন। আর যদি সে রাজআজ্ঞা শান্তভাবে পালন করে তাহা হইলে সময়ে রাজা তাহার দণ্ড হ্রাসও করিয়া থাকেন। সেইরূপ ঈশ্বরীয় আইনবশে তুমি এই শরীররূপী জেলখানায় আসিয়াছ। এই জেলখানাকে তুমি

অন্যায় পূর্ব্বক স্বইচ্ছায় কষ্ট দিলে বা নষ্ট করিলে, ঈশ্বরীয় বিধানে তোমাকে বিশেষ দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। আর যদি তুমি এই শরীরে তাঁহার আজ্ঞা যথাযথ পালন কর তাহা হইলে তাঁহার কৃপায় এই শরীর-রূপী জেলখানা হইতে ত্রাণ পাইবে অর্থাৎ মুক্ত হইবে। এই শরীরের ভোগ ক্ষয় হইলে ইহা স্বাভাবিক নিয়মেই নষ্ট হইয়া যাইবে।

অতএব তুমি মাতৃস্তন্য পান কর। তোমার মা তোমাকে স্তন্য দিবার সময় উহা গঙ্গাজলে ধুইয়া লইবে। তখন সেই জাতিস্মর চর্ম্মকার বালক পাগলীর উপদেশ পাইয়া বলিল—

ভক্তি বীজ বদলে নহী জো যুগ জায় অনন্ত।
উচ নীচ ঘরমে উপজে হোয় সন্তকা সন্ত॥

অর্থাৎ

যেমন অনন্ত যুগেও ভক্তিবীজ নষ্ট হয় না, সেইরূপ সন্ত উচ্চ বা নীচ কূলে জন্ম গ্রহণ করিলেও সাধুই হয়। বালকের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া পাগলী হাসিতে হাসিতে তথা হইতে চলিয়া গেল। কালে এই বালকই ভক্ত 'রবিদাস' নামে প্রসিদ্ধ হয়। 'জয়গুরু'

(৫)

একদা জনৈক ভক্ত শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর নিকট বলিলেন,

মহারাজ! আশীর্বাদ করুন যাহাতে আমি জীবনে উন্নতি লাভ করিতে পারি। ভক্তের শুভ ইচ্ছার বিষয় অবগত হইয়া শ্রীশ্রীগুরু মহারাজজী তদুত্তরে বলিলেন, বাছা! (আমি সততই তোমার মঙ্গল কামনা করিয়া থাকি। তোমরা তোমাদের শুভ ইচ্ছাকে ফলীভূত করিবার জন্য ক্রিয়াশীল হইলেই উহা সহজ হইবে।) গীতা বলেন—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৬।৫

ইহাতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, উন্নত বা অবনত হওয়ার মূল হইতেছে নিজেই। যে উন্নত হয় সে নিজে-ই আপনার সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করে আর যে অবনত হইয়া থাকে সে স্বয়ং নিজের শত্রু হয়। ইহা শ্রবণে ভক্ত কহিল, মহারাজ! স্বয়ং নিজের বন্ধু হওয়া যায় কিরূপে? তদুত্তরে শ্রীশ্রীগুরু মহারাজজী বলিলেন হ্যাঁ, তাহাই বলিতেছি সাবধান হইয়া শোন। স্বয়ং নিজের বন্ধু হইতে হইলে স্বাভাবিক বিষয়-প্রবন ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিতে হইবে 'তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়ান্যাদৌ নিয়ম্য....'। কেন না, (প্রাকৃতিক নিয়মে যখন বিষয়াসক্ত মন অসংযত ইন্দ্রিয়-গণকে অনুবর্ত্তন করে তখন স্বয়ং নিজের শত্রু হইয়া পড়ে, আর যখন বিষয়-বিমুখ সংযত ইন্দ্রিয়গণ সাধন-সিদ্ধ মনকে অনুবর্ত্তন করে তখন স্বয়ং নিজের বন্ধু হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় যে শুভ ইচ্ছার উদয় হয় (যাহাকে শ্রীশ্রীগুরু মহারাজজী

'আত্মকৃপা' বলিতেন) সেই শুভ ইচ্ছাকে ক্রিয়াশীল করিতে পারিলেই উন্নত হওয়া সম্ভবপর হয়।) ইহা শ্রবণে ভক্ত শুভ ইচ্ছাকে ক্রিয়াশীল করিবার সহজ উপায় অবগত হইবার বাসনা প্রকাশ করায়, উত্তরে শ্রীশ্রীগুরু মহারাজজী বলিলেন—(শুভ ইচ্ছাকে ক্রিয়াশীল করিবার জন্য সহজ ও সরল উপায় হইতেছে 'মৌমাছি' হওয়া অর্থাৎ সকলের দোষ পরিহার পূর্ব্বক গুণানুসন্ধান করা। গোস্বামীজীর ভাষায় বলিব—'অবগুণ ত্যজী সবকে গুণ গহহী"।) অপর এক সাধকও গাহিয়াছেন—

'পরগুণপরমাণূন্ পর্ব্বতি কৃত্য নিত্যং
নিজহৃদি বিকসন্তঃ সন্তি সন্তঃ কিয়ন্তঃ।'

অর্থাৎ

(অপরের তিল প্রমাণ গুণকে তাল প্রমাণ ভাবিয়া খুব বিরল সাধুরই হৃদয় আনন্দে পুলকিত হইয়া থাকে।) শ্রীশ্রীগুরু মহারাজজীর নীতিগর্ভ বচন শুনিয়া ভক্ত বলিল, মহারাজ! আমাদের এমন স্বভাব হইয়া গিয়াছে যে, অপরের ছোট্ট দোষকে ফলাও করিয়া বলিতে পারিলে আমরা আনন্দ পাই। তখন শ্রীশ্রীগুরু মহারাজজী বলিলেন,—না বাছা—উহা ঠিক নহে। উক্ত আচরণ যদি স্বভাব হইয়া যায় তাহা হইলে উহা ত্যাগ করা বিশেষ আয়স সাধ্য জানিবে। আর যদি উক্ত আচরণ অভ্যাসমাত্র হয় তাহা হইলে উহা ত্যাগ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। যে কোন অভ্যাস দীর্ঘদিনে

স্বভাবে পরিণত হইয়া থাকে। সেইজন্য বদ অভ্যাসগুলি স্বভাবে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই ত্যাগ করিতে হইবে।

মৌমাছি যেমন সর্ব্বপ্রকার ফুলে বসে কিন্তু তথা হইতে উহারা কেবল মধু সংগ্রহ করিয়া থাকে, সেইরূপ তোমাদেরও দোষ ও গুণময় সংসারের মধ্যে থাকিয়া সংসার হইতে কেবল গুণ গ্রহণ করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে একটি ঘটনার কথা বলি, উহা তোমরা শোন—

আমি যখন হিমালয় প্রদেশে তৃতীয়বার ভ্রমণ করি, সে সময় পূর্ণানন্দ (ব্রহ্মচারী শিষ্য) ও দুইজন পিট্টু (মুটে) আমার সঙ্গে ছিল। আমরা মন-মহেশের পথে এক চড়াইএ উঠিতেছি, কিছু দূর যাইয়া দেখি—পিছনে পূর্ণানন্দ নাই। তাহাকে পিছনে না দেখিয়া আমি অপেক্ষা করিলাম। কিয়ৎকাল পরে পূর্ণানন্দ আসিয়া পৌঁছিল বটে, কিন্তু দেখি যে তাহার চোখদুটি ঘোর লালবর্ণ হইয়াছে এবং মাতালের মত টলিতেছে। তাহার পা মাটিতে কিছুতেই স্থির থাকিতেছে না দেখিয়া তাহাকে ধরিয়া বসাইলাম। পাহাড়ী লোকেরা পাহাড়ের সব ভেদ জানে বলিয়া এরূপ হওয়ার কারণ সম্বন্ধে পিট্টুদের জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল,—এ বালককে বিষের হাওয়া লাগিয়াছে। বলিল—'ঐ যে লাল লাল ফুল দেখা যাইতেছে—উহা কালকূট বিষের ফুল, উহার গন্ধ গ্রহণে মানুষ মরিয়া যায়। এ বাবাকে কিছু টক্ খাওয়াইয়া দিলে বিষ নষ্ট হইয়া যাইবে।' ইহা

শুনিয়া—আমাদের নিকট কিছু তেঁতুল ছিল উহা তাড়াতাড়ি জলে চট্‌কাইয়া পূর্ণানন্দকে সেই জল পান করাইয়া দিলাম। কিছুক্ষণ পরে পূর্ণানন্দ কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল। পরে কালকূট বিষ ফুলের উপর মধুপানরত অসংখ্য মৌমাছি দেখিয়া শ্রীভগবানের বিচিত্র সৃষ্টি মহিমার কথা ভাবিয়া মুগ্ধ হইলাম।

মুগ্ধ হইয়াছিলাম এইজন্য যে এই ক্ষুদ্র জীবের এমন কি সুক্ষ্ম শক্তি আছে যদ্দ্বারা সে বিষ-পুষ্প হইতে কেবল মধুই লইতেছে। উহার দোষাংশ ত্যাগ করিয়া গুণাংশই গ্রহণ করিতেছে। মানুষকে বহুদিন সাধন করিয়া যাহা লাভ করিতে হয় তাহা এই ক্ষুদ্র জীবেরা সহজে প্রাপ্ত হইয়াছে। যখন সেই কীটের গুণানুসন্ধানে আরও প্রবৃত্ত হইলাম—তখন দেখি যে এই ক্ষুদ্র মৌমাছির বহু গুণ আছে। প্রথমতঃ ইহারা সর্ব্বপ্রকার পুষ্প হইতে মধু গ্রহণ করে। সম্ভব পক্ষে কোন ফুলই বাদ দেয় না। উহারা সুগন্ধি পুষ্প হইতে মধু নেয় আবার কালকূট বিষ ফুলের মধুও খায়। কিন্তু উহার বিষ তাহাদের বিষাক্ত করে না। আবার এই ক্ষুদ্র জীবের অধ্যবসায়ের কথা ভাবিলে সত্য সত্যই উৎসাহ আসে। এ সংসারে যত পরিমাণ মধু খরচ হয় সব মধু ঐ ক্ষুদ্র জীবেরই পরিশ্রম-লব্ধ। উহারা নিজ কঠোর পরিশ্রম-লব্ধ মধু অপরকে বিলাইয়া দেয়। আরও দেখ—ইহাদের পরস্পরে হিংসা দ্বেষ নাই। (এক মৌচাকে লক্ষ লক্ষ মৌমাছ থাকে কিন্তু পরস্পরে কোনও বিবাদ নাই। রাণী মৌমাছি চাক

ছাড়িয়া যাইলে তাহারাও উহার পিছনে পিছনে চলিয়া যায়। ইহার দ্বারা তাহাদের সহানুভূতি, অনাসক্তি ও গুণগ্রাহিতারই পরিচয় পাওয়া যায়। আবার আর এক রকমের মাছি আছে, উহারা যেখানে বসে তথায় ঘা হইয়া যায়।

কালকূট বিষ ফুলের ন্যায় এ সংসারও দোষগুণ মিশ্রিত। দেখা যায় এই সংসাররূপী চাকে-ও মাছির মত দুই রকমের লোক আছে। একে সংসার হইতে দোষ এবং অপরে সংসার হইতে গুণ গ্রহণ করিয়া থাকে। তাই আমার উপদেশ— তোমরা মৌমাছির মত হও। তোমরা যখন উহাদের মত দোষ ত্যাগ করিয়া এই সংসারের সকল বস্তু হইতে কেবল গুণ গ্রহণ করিতে পারিবে তখন তোমাদের চিত্ত মধুচাকে পরিণত হইবে। ইহার দ্বারা তোমাদের যে-পরম কল্যাণ সাধিত হইবে এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। অপরের দোষ না দেখিয়া গুণ দেখা আর নিজের গুণ না দেখিয়া দোষ দেখা এবং উহা ত্যাগ করিতে যত্নবান হওয়া উন্নত জীবন লাভের সুন্দর, সহজ ও সরল উপায় জানিবে।

অতএব যত্নপূর্ব্বক পরের দোষানুসন্ধান ত্যাগ করিতে হইবে। শাস্ত্রে পাওয়া যায় একদা পার্ব্বতী মহারাণী বলেন— 'জপাৎ শুদ্ধিঃ জপাৎ শুদ্ধিঃ জপাৎ শুদ্ধিঃ বরাননে'। সুতরাং কেবল জপের দ্বারাও যে চিত্তশুদ্ধি হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাই আমিও জপের উপর বিশেষ জোর দিই। কিন্তু

অনেকে আমাকে জানায় যে আমি বহুদিন জপ করিলাম পরন্তু আমার চিত্ত শুদ্ধ হইল না কেন? তদুত্তরে বলি যে—(তোমরা জপ কর ঠিক কিন্তু অপরের দোষানুসন্ধান ত্যাগ কর না তাই চিত্ত শুদ্ধ হয় না, সুতরাং মলিনই থাকে।) মনে কর যেমন কোন বাড়ীর ঘরদুয়ার ঝাড়িয়া মুছিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হইতেছে কিন্তু উক্ত ঘর দুয়ারের জানালা কপাট বন্ধ না থাকায় সেই সময় ঝঞ্ঝাবাতে ধুলো বালি আসিয়া ঘর দুয়ার আবার অপরিষ্কার হইয়া যায়,—সেইরূপ তোমরাও জপ কর এবং কথঞ্চিৎ চিত্তমল দূরও হয় কিন্তু অপরের দোষানুসন্ধানরূপ ছাই পাঁশে চিত্ত ভরিয়া যাওয়ায় আবার চিত্ত মলিন হইয়া থাকে। এ যেন হাতীর নাওয়া। মাহুত হাতীকে জলে নামাইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিল বটে, কিন্তু হাতী জল হইতে উপরে উঠিয়া আবার ধুলো বালি মাখিয়া যেমন ছিল তেমনই হইয়া থাকে।

সেইজন্য ভাষা-ভেদে সকল ধর্ম্মেই চিত্তমল দূর করিবার উপদেশ দেখা যায়।

হিন্দুরা বলে—চিত্ত শুদ্ধ কর। মুসলমানেরা বলে—দিল্ সাফ্ কর। কেবল ভাষার ভেদ মাত্র কিন্তু আসল উদ্দেশ্য উভয়েরই এক। সুতরাং আমারও উপদেশ হইল চিত্তশুদ্ধির জন্য তোমরা ক্রিয়াশীল হও। অপরের দোষানুসন্ধানরূপ ছাই পাঁশের আবরণে চিত্তকে মলিন হইতে দিওনা, পক্ষান্তরে সকলের মহৎ গুণাবলীর অনুশীলনে চিত্তশুদ্ধি কর।

মৌমাছি যেমন প্রত্যেক পুষ্প হইতে বিন্দু বিন্দু করিয়া মধু সংগ্রহ করে, তোমরাও সেইরূপ প্রত্যেকের মধ্য হইতে এক একটি গুণ লইয়া গুণাকর হইয়া উঠ। তোমরা যদি ভীষ্মদেবের—'প্রতিজ্ঞা পালন', রাজর্ষি ভরতের—'দয়া', কর্ণের —'দান', মহর্ষি দধীচির—'আত্মত্যাগ', ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের—'ক্ষমা', শুকদেবের—'জ্ঞান' ও দেবর্ষি নারদের—'ঈশ্বরপ্রেম' রূপ গুণাবলীর অনুশীলনে রত হও তাহা হইলে তোমরা ধন্য হইয়া যাইবে। (এই সংসারের সকল বস্তুতেই কিছু না কিছু গুণ আছেই। তোমাকে কেবল উহা গ্রহণ করিতে হইবে—তবে তোমার চিত্ত গুণে ভরিয়া উঠিবে এবং তখনই তুমি এই রাগদ্বেষময় সংসাররূপ চাকে প্রকৃত মধুর সন্ধান পাইবে।)

ধার্ম্মিক সাধক দীর্ঘকাল নিরন্তর শ্রদ্ধা ও বীর্য সহকারে মধুব সন্ধানে রত থাকিলে—সময়ে সেই মধু-পুরুষ, সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থিত সুহৃদ্ যিনি, যিনি সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞের এমন কি যজ্ঞরূপ এই সংসারের এবং অশুদ্ধিক্ষয়কারী কায়েন্দ্রিয়-সিদ্ধিপ্রদ তপস্যাসমূহের ভোক্তাস্বরূপ সেই সর্ব্বলোকের মহান্ ঈশ্বরকে জানিয়া তাঁহার কৃপালাভে সাধক মধুময় হইয়া কৃতার্থ হয়

'জয়গুরু'

(৬)

হাওয়াখোরী বাবুরা অনেকেই শ্রীশ্রীগুরুমহারজজীর শ্রীচরণ দর্শনে আসিতেন। একদিন তাঁহাদের ভিতর হইতে একজন বলিলেন—মহারাজজী, আমি বহু দিন যাবৎ আপনার সুমধুর সদুপদেশ শুনিয়া আসিতেছি। আমি বুঝিয়াছি যে আপনি একজন মহাপূরুষ। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন যাহাতে আমার কল্যাণ হয়। তখন শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজী তাঁহার স্বভাব সুলভ ভঙ্গিমায় বলিতে লাগিলেন। বলিলেন—"আপনার শুভ ইচ্ছার উদয় হইয়াছে। সুতরাং আপনি কল্যাণকামী। কল্যাণের মূল শ্রীভগবান। আপনি তাঁহাকে ধরুণ। ইহাতে আপনার প্রকৃত কল্যাণ হইবে।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

গীতা ১৮।৬২

শাস্ত্রে কল্যাণের স্তর ভেদে বিধি ও নিষেধ মূলে অনেক কথাই আছে। আমি ঐ শাস্ত্র বাক্যগুলিকে আমার অনুভবের সহিত মিলাইয়া কল্যাণকামীদের দিয়া থাকি। আমি বলি—(কল্যাণকামীদের সৎসঙ্গ করার প্রয়োজন আছে। সমস্ত কল্যাণের যা মূল শ্রীভগবান, তাঁহার প্রাপ্তির উপায় সৎসঙ্গের মধ্যেই পাওয়া যায়।") বাঙ্গালায় একটি প্রবাদ বাক্য আছে যে— 'সৎসঙ্গে স্বর্গবাস অসৎসঙ্গে নরকবাস'

আমি এ সম্বন্ধে একটি গল্প বলি, তুমি মন দিয়া শোন, তাহা হইলে বিষয়টি বেশ সহজে বুঝিতে পারিবে। গল্পটি এইরূপ—

কোনও নগরে সপুত্র একটি চোর বাস করিত। বুড়ো হওয়ায় চোর যখন চুরি করিবার শক্তি হারাইল তখন সে তাহার পুত্রকে চুরি করিতে শিখাইল এবং বলিল তুমি আমার তুইটি কথানুযায়ী কাজ করিলে তোমার কোনও ভয় আসিবে না। প্রথমটি হইতেছে—তুমি কখনও সাধু সঙ্গ কবিবে না। আর দ্বিতীয়টি—চুরি করিয়া কখনও সত্য কথা বলিবে না। অভিজ্ঞ চোরের তুইটি কথা বলিবার কারণ এই যে—সাধুসঙ্গ লাভ হইলে সৎপ্রবৃত্তির উদয়ে ছেলের আর চুরি করিতে প্রবৃত্তি হইবে না এবং চুরি করিয়া সত্যকথা বলিলেও রাজশাসনে তাহার চুরি করিবার প্রবৃত্তি নষ্ট হইয়া যাইবে।

যাহা হউক, সেই বৃদ্ধ চোরের ছেলে চুরি করিতে আরম্ভ করিল। একদা সে রাজবাড়ীতে হানা দিয়া নিদ্রিত অবস্থায় রাজপুত্রকে হত্যা করিয়া তাহার সমস্ত মূল্যবান অলঙ্কারাদি লইয়া পলায়ন করিল। রাত্রি অবসানে রাজা সমস্ত অবগত হইলেন এবং রাজপুত্রের হত্যাকারী চোরকে ধরিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিলেন। কয়েকদিন মধ্যেই পুলিশ সেই চোরকে পাকড়াও করিয়া বলিল—আমরা বহু প্রমাণ বলে জানিতে পারিয়াছি যে তুমিই রাজপুত্রকে হত্যা করিয়া

তাঁহার মূল্যবান বহু অলঙ্কারাদি লইয়া গিয়াছ। পুলিশের অভিযোগ শুনিয়া সেই চোর বলিল যে—না, আমি কাহারও হত্যাকারী নহি এবং চুরিও করি নাই। কারণ সে তাহার পিতার নিকট হইতে উপদেশ পাইয়াছিল যে 'চুরি করিয়া কখনও সত্য কথা বলিবে না' এবং একথা তাহার মনে ছিল। পুলিশের হাতে বহু প্রমাণ থাকায় পুলিশ চোরকে হাতকড়ি লাগাইয়া রাজ সমীপে লইয়া চলিল। রাজ সমীপে যাইবার পথে, পথি মধ্যে এক গাছ তলায় এক সাধু বসিয়া বহু ভক্তজনকে উপদেশ দিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া চোর ভাবিল পিতা বলিয়াছেন যে—'সাধুসঙ্গ করিবে না, সুতরাং সাধুর উপদেশ শুনিব না মনে করিয়া কানে আঙ্গুল দিবার চেষ্টা করিল কিন্তু হাতে হাত কড়ি থাকায় কানে আঙ্গুল দিতে পারিল না। এই অবসরে চোর শুনিতে পাইল যে—'দেবতার ছায়া পড়ে না, দেবতার পা মাটিতে পড়ে না, শূন্যে থাকে আর তাঁহাদের চোখের পলকও পড়ে না।'

পর দিন পুলিশ চোরকে রাজসভায় উপস্থিত করিল। চোর রাজসমীপেও দোষ স্বীকার করিল না। এদিকে বহু প্রমাণ হস্তগত সুতরাং রাজা চোরকে বন্দীরূপে রাখিবার হুকুম দিলেন এবং রাজ্যে ঘোষণা করিলেন যে—যে কেহ এই চোরের স্বীকারোক্তি আদায় করিয়া দিবে সে পুরস্কৃত হইবে।

রাজ-ঘোষণার বিষয় অবগত হইয়া এক বেশ্যা উক্ত চোরের স্বীকারোক্তি আদায় করিয়া দিবে বলিয়া রাজ-সকাশে জানায় এবং বলে যে রাত্রিকালে যখন আমি অন্যবেশে জেলখানায় চোরের নিকট যাইব তখন যেন কোন প্রহরী আমাকে বাধা না দেয়। রাজা বেশ্যার সর্ত্তে রাজী হইলেন ও প্রহরীকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন এবং জল্লাদকে আজ্ঞা করিলেন যে উক্ত চোর এই বেশ্যার নিকট স্বীকারোক্তি করিলেই তুমি সেই চোরের শিরচ্ছেদন করিবে। কারণ রাজকুমারের হত্যাকারীর প্রাণদণ্ডই বিধান।

রাজাজ্ঞা পাইয়া সেই বেশ্যা মধ্য রাত্রিতে কালীমায়ের রূপ ধারণ করিয়া যথায় চোর রহিয়াছে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। চোর সেই বেশধারিণী কালিমাকে সম্মুখে দেখিয়া তাহাকে উপাস্যজ্ঞানে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিল। কারণ চোর ডাকাতরা কালীমায়েরই উপাসক হয়। তখন ছদ্মবেশিনী কালী মা উক্ত চোরকে বলিলেন—অরে পুত্র! আমি তোমার উপাস্য দেবী, তোমার উপর বিপদ আসিয়াছে, উহা হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমি তোমার নিকট আসিয়াছি। তুমি আমার নিকট মিথ্যা কথা বলিও না। সত্য করিয়া বল—যে, রাজপুত্রকে হত্যা ও চুরি তুমিই করিয়াছ কি না? ছদ্মবেশিনী ইষ্ট দেবীর কথা শুনিয়া চোর ভয় পাইয়া মনে মনে ভবিতেছিল যে ইষ্ট দেবীর সম্মুখে মিথ্যা না বলিয়া সত্য কথাই বলিব কিন্তু এমন

সময় হঠাৎ তাহার সাধুর উপদেশের কথা মনে পড়িল এবং সে দেখিল যে—উপস্থিত কালীমায়ের ছায়া পড়িয়াছে, পাও মাটিতে রহিয়াছে এবং চোখের পাতাও পড়িতেছে। সুতরাং ইনি আমার উপাস্য দেবী নহে। মনে হয়—এ কোন মেয়ে মানুষ কালীমায়ের রূপ ধারণ করিয়া আমায় ছলনা করিতে আসিয়াছে। অতএব চোর তখন ছদ্মবেশিনী ইষ্ট দেবীর নিকট বলিল—হে আমার ইষ্ট দেবী মাতা, আমার হৃদয়ের সমস্ত ভাব ও ইন্দ্রিয়বর্গের সমস্ত কার্য্যের সাক্ষী, আপনি আমাকে ছলনা করিবেন না। আমি আপনার অবোধ ছেলে ও আপনার দাস। আমি সত্যই বলিতেছি যে, রাজপুত্রের হত্যা বা চুরি সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। হে মাতঃ, আমাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করুন।

চোর স্বীকৃত না হওয়ায় ছদ্মবেশিনী কালীমা জেলখানা হইতে বিদায় লইল এবং রাজাও কোন প্রমাণ না পাওয়ায় উক্ত চোরকে মুক্তি দিলেন। চোর জেলখানা হইতে মুক্ত হইয়া বিচার করিতে লাগিল যে—আমার পিতা আমাকে সাধুসঙ্গ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাধুর উপদেশ যদি শুনিতে না পাইতাম তাহা হইলে আমি ছদ্মবেশিনী কালীকে উপাস্য দেবী ভাবিয়া তাহাকে সত্য কথা বলিয়া ফেলিতাম আর আমার প্রাণদণ্ড হইত। রাস্তা চলিতে চলিতে সাধুর উপদেশ কানে আসায় আমি প্রাণে রক্ষা

পাইলাম। অতএব যদি আমি সব সময় সাধুসঙ্গ করি তাহা হইলে আমার অশেষ কল্যাণ হইবে। সুতরাং আমি আর পিতৃ সকাশে যাইব না এবং চুরিও করিব না। উক্ত বিচার দৃঢ় হওয়ায় সেই চোর সাধু হইয়া গেল।

ইহার দ্বারা প্রমাণ হইল এই যে—অনিচ্ছালব্ধ ক্ষণিক সাধু সঙ্গের প্রভাবে চোর প্রাণে বাঁচিল এবং সে সাধুভাব ধারণ করিল। তাই শাস্ত্র বলেন—'বিনু সৎসঙ্গ বিবেক ন হোঈ।' আমাদের ধর্ম্ম শাস্ত্রের মধ্যে এইরূপ বহু ঘটনার বর্ণনা আছে। আপনারা সকলেই জানেন যে—রামায়ণের লেঠেল রত্মাকর ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গলাভে মহর্ষি বাল্মিকী হইলেন। সুতরাং ইহা সঙ্গ প্রভাবেরই জয় গাঁথা। সৎসঙ্গ লাভ মুক্তি অপেক্ষা সুখকর—

তাত স্বর্গ অপবর্গ সুখ ধরিঅ তুলা এক অঙ্গ।
তুল ন তাহি সকল মিলি জো সুখ লব সৎসঙ্গ॥

রামচরিত মানস।

সুতরাং স্থির হইল যে (সজ্জনের সঙ্গ লাভের ইচ্ছা ও তাঁহার সঙ্গলাভ সৎজীবন লাভের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন।)

ইহা শুনিয়া জনৈক শ্রোতা বলিলেন, মহারাজ জী! সৎ সঙ্গের ইচ্ছা থাকিলেও সময়মত সকল স্থানে সৎপুরুষই পাওয়া যায় না, আর যদি বা কেহ থাকেনও আমরা তাঁহাকে

চিনিতে পারি না। তদুত্তরে শ্রীশ্রীগুরু মহারাজজী বলিলেন, আমি আপনার কথা স্বীকার করি যে—

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা
বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎসুখসাগরেঽস্মি-
ল্লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥

ঐরূপ সৎপুরুষ পাওয়া যায় না। কিন্তু সঙ্গলাভেচ্ছুক অপেক্ষা উন্নততর বা উন্নততম পুরুষের অভাব হয় না, যদি আন্তরিক ইচ্ছার তাগিদ থাকে। আপনারা যদি গীতা, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণ তথা সৎগ্রন্থ বা পত্রিকার সঙ্গ করেন তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে— আপনারা ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি, দেবর্ষি আদি কত-শত মহান পুরুষের সঙ্গ পাইতেছেন—যাঁহাদের একটি মাত্র উপদেশ পালনে জীবন ধন্য হইতে পারে। এক কথায় বলা চলে যে, মহৎজনের সঙ্গ লাভ না হইলে কিছুই হয় না। গোস্বামীজীর রামায়ণ বলেন—

'বিনু সৎসঙ্গ ন হরিকথা তেহি বিনু মোহ ন ভাগ।
মোহ গএ বিনু রাম পদ হোই ন দৃঢ় অনুরাগ॥'

'জয়গুরু'

(৭)

একদা জনৈক ভক্ত শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর শ্রীচরণ দর্শনে আসিলে কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর তিনি হাসিয়া বলিলেন—ভালই হইল তুমি আসিয়াছ, তোমার সহিত ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু পরামর্শ আছে। ইহা শুনিয়া ভক্ত সসম্ভ্রমে বলিলেন, এতো হাসির কথা মহারাজ! আমি আপনাকে ব্যবহার সম্বন্ধে কিবা পরামর্শ দিব। আপনি ব্যবহার ও পরমার্থকে এক করিয়া লইয়াছেন। আপনার ব্যবহার নিষ্কাম, সুতরাং পরিশুদ্ধ। আর আমার ব্যবহার সকাম, সুতরাং অশুদ্ধ। আশীর্ব্বাদ করুন যাহাতে আমার ব্যবহার শুদ্ধ হয়।

অনন্তর শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজী মৃদু হাস্যের সহিত বলিলেন—আচ্ছা ভাই, তুমি পরামর্শ না দাও—দিও না। কিন্তু এ সময় এখানকার আবহাওয়া ভাল, তুমি এখানে কিছুদিন বাস কর। এ আশ্রমে অধিক সময়ই ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় সৎকথা হইয়া থাকে, উহাতে তুমিও যোগদান কর। তদুত্তরে তিনি বলিলেন—মহারাজ, ঈশ্বর সম্বন্ধীয় আলোচনায় আমার রুচি হয় না।

ইহা শুনিয়া শ্রীশ্রীগুরু মহারাজজী অতি প্রীতি সহকারে মৃদুস্বরে বলিলেন—এর কারণ অন্য কিছু নয়, ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমার অরুচি হইয়াছে। এও এক প্রকার কঠিন ব্যাধি। ইহার সম্ভাব্য ফল সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন—'ন চেদিহাবেদীন্মহতী

বিনষ্টিঃ' অর্থাৎ ইহা মহান্ হানিকারক। তবে এ রোগেরও পাচন আছে। তোমাকে উহা খাইতে হইবে। উহার সেবনে রোগ সারিয়া যাইবে। কিন্তু উহা বড্ড তেঁতো, লোকে উহা সেবনে সহজে রাজী হয় না। তথাপি বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা কৌশলে উহার প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

অনন্তর ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—মহারাজজী, তেঁতো পাচন সম্বন্ধে কিছুই বুঝিলাম না, উহা কি? তখন শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজী বলিলেন—তেঁতো পাচন অন্য কিছুই নহে। উহা সংযমপ্রধান জীবন, যাহার প্রভাবে স্বার্থভাব নষ্ট হইয়া মনে পরমার্থ ভাবের অনুপ্রেরণা জাগে।

সাত্ত্বিকগুণপ্রধান উত্তম অধিকারীগণকে লোভ বা ভয় দেখাইতে হয় না। কারণ তাহারা স্বতঃই সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু রজঃ ও তমগুণ প্রধান মধ্যম ও অধম অধিকারীগণকে লোভ বা ভয় না দেখাইলে তাহাদিগকে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করা যায় না। তাই অধিকারী ভেদে উপদেশের বিধান আছে। শাস্ত্র অধিকার ভেদেই—যথার্থ, রোচক তথা ভয়ানক বাক্যের কথা বলিয়াছেন। যথার্থ বাক্য—যেমন কাহারও অসুখ করিয়াছে। ডাক্তার ঔষধের ব্যবস্থা করিল। তখন যদি রোগী কোনওরূপ ওজর আপত্তি না করিয়াই ডাক্তারের বিধানানুযায়ী ঔষধ সেবন করে তাহা হইলে রোগ ভাল হয়। সেইরূপ সাধকের পক্ষে ত্রিতাপময় সংসারে ভবযন্ত্রণা ভোগ হইতে নিবৃত্তি

পাইবার জন্য শ্রীগুরুদেব উপদেশ করেন—'সর্ব্বতোভাবে শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণ কর।' উহা শুনিয়া সাধক যদি শ্রীভগবানের শরণে আসে তাহা হইলে ভবযন্ত্রণারও নিবৃত্তি হয়।

রোচক বাক্য—যেমন কোন বালকের রোগ হইয়াছে। বৈদ্য তিক্ত পাচনের ব্যবস্থা করিল। উহা শুনিয়া বালক বলিল, আমি ঔষধ খাইবনা। তখন চতুর বৈদ্য বলিলেন—এ ঔষধ খাইলে পরে সন্দেশ খাইতে দিব। তখন যেমন বালক লোভের বশবর্ত্তী হইয়া ঔষধ সেবন করে ও রোগ সারিয়া যায়। সেইরূপ রজোগুণপ্রধান মধ্যম অধিকারী সাধকের পক্ষে শ্রীভগবানের শরণ লাভের উপায় স্বরূপ শ্রীগুরুদেব উপদেশ করেন—যজ্ঞ কর, দান কর, তপস্যা কর তাহা হইলে পুণ্য সঞ্চয় হইবে। উহার দ্বারা স্বর্গলাভ হইবে এবং তথায় অমৃত পান করিবে ও স্বর্গের সুখ ভোগ করিবে। ইহা শুনিয়া সাধক যদি যজ্ঞ, দান ও তপাস্বরূপ পুণ্য অনুষ্ঠান করে তাহা হইলে ক্রমশঃ পাপ নাশ হইয়া পুণ্যোদয়ে শ্রীভগবানের প্রতি প্রেম হয় ও তাঁহার ভজন করে। গীতা বলেন—

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥ ৭।২৮

সুতরাং কল্যাণ লাভ হয়।

আর ভয়ানক বাক্য হইল—যেমন কোন শোকাতুরের ব্যাধি হইয়াছে। ঔষধের ব্যবস্থা করিলেও সেবন করে না। এমতাবস্থায় কোনও মনস্তাত্ত্বিক আসিয়া বলিলেন—তুমি যদি ঔষধ সেবন না কর মরিয়া যাইবে। তখন মরণের ভয়ে সে ঔষধ খায়। সেইরূপ তমোগুণপ্রধান অধম অধিকারী সাধক শ্রীভগবানের ভজন করে না। তজ্জন্য তাহাকে নরক নামের বিভীষিকাময় দৃশ্য বর্ণনা পূর্ব্বক সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতে হয়। তখন সে কল্যাণ-পথের পথিক হইয়া থাকে। অন্যথায় সে বর্ত্তমান অপেক্ষাও নিকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হয়।

'জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ' গীতা ১৪।১৮

উক্তরূপে অধিকারী ভেদে উপদেশের বিধান আছে। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া একই উপদেশ আপামরের পক্ষে সমীচীনও নহে। তাই শ্রীগুরু অধিকার ভেদে উপদেশ করেন এবং তাঁহার নিকট হইতেই বিপন্মুক্ত, সরল ও শোভন সাধন পথের সন্ধান পাওয়া যায়।

ইহা শুনিয়া ভক্ত বলিলেন—মহারাজ ধর্ম্মের সকল কথাইতো শাস্ত্রের মধ্যে আছে। ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িয়াই সব জানিয়া লইতে পারা যায় যখন, তখন আর গুরু করণের প্রয়োজন কি?

অনন্তর শ্রীশ্রীগুরু মহারাজজী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বাছা, তোমার ছাত্র জীবনে কোনও শিক্ষকের প্রয়োজন হয় নাই কি? তদুত্তরে ভক্ত বলিলেন—হাঁ মহারাজজী, আমার

ছাত্র জীবনে শিক্ষকের প্রয়োজন হইয়াছিল। তখন শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজী বলিলেন—শিক্ষক ছিলেন কেন? বর্ণ পরিচয় পড়িয়াই শিখিতে পারিতে। কিন্তু তা হয় না। শিক্ষক তাঁহার অভিজ্ঞতা ছাত্রকে দেয়। তিনি বলেন এইটি—'ক' এইটি— 'খ' তবে ছাত্র বুঝিতে পারে এবং পরে বিদ্বান হয়। বিদ্যাশিক্ষায় যে কারণে তোমার শিক্ষকের প্রয়োজন ছিল, সেই কারণেই ধর্ম্ম শিক্ষায়ও গুরুর প্রয়োজন আছে। শাস্ত্র মধ্যে সমস্তই আছে কিন্তু উহার পরিচয় করাইয়া দেবে কে? শাস্ত্রের মর্ম্মকথা বোঝা অত্যন্ত কঠিন। উহার অভিজ্ঞতা যাঁহার আছে, তিনিই উহা বুঝাইতে পারেন। অন্যথায় হিতে বিপরীত হয়। তাই শ্রোত্রিয় (শাস্ত্রজ্ঞ) গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণ করিবার বিধান আছে ঃ—

'শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুমভিগচ্ছেৎ'

শ্রীগুরু অধিকারী নির্ণয় করেন পরীক্ষার মধ্যদিয়া, তাহা না হইলে শিষ্য উপদেশ ধারণে সমর্থ হয় না। সুবর্ণের বিশুদ্ধতা নির্ণয় যেমন চারিটি পরীক্ষার মধ্য দিয়া স্থির হয়, সেইরূপ শিষ্যকেও চারিটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়। উহার প্রথমটি—ঘর্ষণ, দ্বিতীয়টি—তাপ (দহন) তৃতীয়টি—ছেদন ও চতুর্থটি হইতেছে—তাড়ন।

যেমন সুবর্ণকে প্রথমে কষ্টিপাথরে ঘসিয়া দেখিতে হয়। কিন্তু উহাতে দৃঢ় হইবার জন্য সুবর্ণকে পোড়াইয়া দেখা হয় যে

আর ভয়ানক বাক্য হইল—যেমন কোন শোকাতুরের ব্যাধি হইয়াছে। ঔষধের ব্যবস্থা করিলেও সেবন করে না। এমতাবস্থায় কোনও মনস্তাত্ত্বিক আসিয়া বলিলেন—তুমি যদি ঔষধ সেবন না কর মরিয়া যাইবে। তখন মরণের ভয়ে সে ঔষধ খায়। সেইরূপ তমোগুণপ্রধান অধম অধিকারী সাধক শ্রীভগবানের ভজন করে না। তজ্জন্য তাহাকে নরক নামের বিভীষিকাময় দৃশ্য বর্ণনা পূর্ব্বক সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতে হয়। তখন সে কল্যাণ-পথের পথিক হইয়া থাকে। অন্যথায় সে বর্ত্তমান অপেক্ষাও নিকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হয়।

'জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ' গীতা ১৪।১৮

উক্তরূপে অধিকারী ভেদে উপদেশের বিধান আছে। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া একই উপদেশ আপামরের পক্ষে সমীচীনও নহে। তাই শ্রীগুরু অধিকার ভেদে উপদেশ করেন এবং তাঁহার নিকট হইতেই বিপন্মুক্ত, সরল ও শোভন সাধন পথের সন্ধান পাওয়া যায়।

ইহা শুনিয়া ভক্ত বলিলেন— মহারাজ ধর্ম্মের সকল কথাইতো শাস্ত্রের মধ্যে আছে। ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িয়াই সব জানিয়া লইতে পারা যায় যখন, তখন আর গুরু করণের প্রয়োজন কি?

অনন্তর শ্রীশ্রীগুরু মহারাজজী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— বাছা, তোমার ছাত্র জীবনে কোনও শিক্ষকের প্রয়োজন হয় নাই কি? তদুত্তরে ভক্ত বলিলেন—হাঁ মহারাজজী, আমার

ছাত্র জীবনে শিক্ষকের প্রয়োজন হইয়াছিল। তখন শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজী বলিলেন—শিক্ষক ছিলেন কেন? বর্ণ পরিচয় পড়িয়াই শিখিতে পারিতে। কিন্তু তা হয় না। শিক্ষক তাঁহার অভিজ্ঞতা ছাত্রকে দেয়। তিনি বলেন এইটি—'ক' এইটি— 'খ' তবে ছাত্র বুঝিতে পারে এবং পরে বিদ্বান হয়। বিদ্যাশিক্ষায় যে কারণে তোমার শিক্ষকের প্রয়োজন ছিল, সেই কারণেই ধর্ম্ম শিক্ষায়ও গুরুর প্রয়োজন আছে। শাস্ত্র মধ্যে সমস্তই আছে কিন্তু উহার পরিচয় করাইয়া দেবে কে? শাস্ত্রের মর্ম্মকথা বোঝা অত্যন্ত কঠিন। উহার অভিজ্ঞতা যাঁহার আছে, তিনিই উহা বুঝাইতে পারেন। অন্যথায় হিতে বিপরীত হয়। তাই শ্রোত্রিয় (শাস্ত্রজ্ঞ) গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণ করিবার বিধান আছে ঃ—

'শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুমভিগচ্ছেৎ'

শ্রীগুরু অধিকারী নির্ণয় করেন পরীক্ষার মধ্যদিয়া, তাহা না হইলে শিষ্য উপদেশ ধারণে সমর্থ হয় না। সুবর্ণের বিশুদ্ধতা নির্ণয় যেমন চারিটি পরীক্ষার মধ্য দিয়া স্থির হয়, সেইরূপ শিষ্যকেও চারিটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়। উহার প্রথমটি—ঘর্ষণ, দ্বিতীয়টি—তাপ (দহন) তৃতীয়টি—ছেদন ও চতুর্থটি হইতেছে—তাড়ন।

যেমন সুবর্ণকে প্রথমে কষ্টিপাথরে ঘসিয়া দেখিতে হয়। কিন্তু উহাতে দৃঢ় হইবার জন্য সুবর্ণকে পোড়াইয়া দেখা হয় যে

কষ্ঠিপাথরে ঘর্ষিত রঙ আসল কি—না ? ইহার দ্বারা সুবর্ণের উপরের রঙ খাঁটি জানিয়া ও উহার ভিতরের রঙ খাঁটি কিনা জানিবার জন্য উহাকে কাটিয়া দেখা হয়। সুবর্ণের উপরের ও ভিতরের রঙ এক প্রতিপন্ন হইলেও উহা খাঁটি কিনা অথবা কত পরিমাণ খাদ আছে জানিবার জন্য হাতুড়ির আঘাত দিতে হয়। সুবর্ণ যদি খাঁটি না হয়—খাদ থাকে, তাহা হইলে হাতুড়ির আঘাতে খাদের অনুপাতে উহা ফাটিয়া যায়, কিন্তু উহা (স্বর্ণ) খাঁটি হইলে ফাটে না। তখন স্বর্ণকারের নিকট স্বর্ণের স্বরূপ প্রকাশিত হয়। এইরূপ বিশুদ্ধ স্বর্ণ-ই ভূষণের উপযুক্ত। উহা হইতে সকল প্রকার (মিহি বা মোটা) ভূষণ তৈয়ারী হইতে পারে। এইরূপ স্বর্ণের ভূষণ তৈয়ারীর পর পালিশ হইলে তখন আর কোনও পরীক্ষার অপেক্ষা থাকে না বরং যে অঙ্গের যাহা ভূষণ তাহা সেই অঙ্গে স্থান পায় এবং অঙ্গের সৌন্দর্য্য সম্পাদন করে।

সেইরূপ শিষ্যের প্রতিও প্রথম ঘর্ষণ (গুরুসেবা) পরীক্ষা আরম্ভ হয়। তাহাতে যদি শিষ্যের কোনও প্রকার ভুল বা আলস্যাদি দোষ না পাওয়া যায় তাহা হইলে বুঝিতে পারা যায় যে, শিষ্য প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। অনন্তর আরম্ভ হয় দ্বিতীয় পরীক্ষা—তাপ (দহন) অর্থাৎ তিতিক্ষা—শীত উষ্ণ, ক্ষুৎপিপাসা, রৌদ্র বর্ষা, মান অপমান আদি দ্বন্দ্বভাবে মন যদি বিকার প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হয় যে, শিষ্য

দ্বিতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। পরে আরম্ভ হয় তৃতীয় পরীক্ষা —ছেদন অর্থাৎ গুরু শিষ্যকে সান্নিধ্যে না রাখিয়া দূরে রাখেন। দূরে থাকিয়াও যদি শিষ্যের মনে কোনরূপ ভাবান্তর না আসে তাহা হইলে জানিতে হয় যে, শিষ্য তৃতীয় পরীক্ষায় সফলতা লাভ করিল। অবশেষে চতুর্থ পরীক্ষা—'চোট' আরম্ভ হয় অর্থাৎ গুরু কারণ অকারণে শিষ্যকে তিরস্কার করেন। লঘু অপরাধে গুরু দণ্ড দেন। উক্তরূপ বৈষম্য ব্যবহারেও যখন শিষ্য বিচলিত না হইয়া শ্রীগুরুর প্রতি অনুরক্ত থাকে তখনই শিষ্য সমুদায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এবং যথার্থ অধিকারী জানিয়া শ্রীগুরু শিষ্যকে বরণ করেন।

এমনিও ব্যবহারে দেখা যায়—এক পয়সার মৃৎপাত্র কিনিতে যাইয়া লোকে উহাকে দু দশবার বাজাইয়া দেখে, তবে দাম দেয়। সেক্ষেত্রে শ্রীগুরু যাহাকে সাধনালব্ধ অপার্থিব বস্তু দিয়া শিষ্যরূপে বরণ করিবেন তাহাকে পরীক্ষা করাই বিধেয়। শ্রীগুরু শিষ্যকে তাড়না করেন তাহারই কল্যাণের জন্য। তাড়না না করিলে শিষ্য বা পুত্রের চরিত্র গঠিত হয় না। যেমন অঙ্গের ভূষণ তৈয়ারীর পূর্বেই সুবর্ণকে আঘাত সহ্য করিতে হয়, সেইরূপ শিষ্যকেও অধিকার লাভার্থ তাড়না সহ্য করিতে হয়। স্মৃতি বলেন :—

'লালনে বহবো দোষাঃ তাড়নে বহবো গুণাঃ।
তস্মাৎ পুত্রঞ্চ শিষ্যঞ্চ তাড়য়েন্নতু লালয়েৎ॥'

বাঙলায় বলা হয় :—

'সন্তান মঙ্গল তরে জননী তাড়না করে'

সুতরাং ছাত্রজীবনে বিদ্যালাভের জন্য যেরূপ শিক্ষকের প্রয়োজন হয়, শিক্ষক ভিন্ন যেমন কেহই বিদ্যালাভে সমর্থ হয় না। সেইরূপ আধ্যাত্মিকজীবন লাভের জন্য শিষ্যেরও শ্রীগুরুর কৃপার প্রয়োজন হয়। অন্যথা উহা লাভ সম্ভব নহে। শাস্ত্র বলেনঃ—'গুরোঃ কৃপাহি কেবলম্।'

'জয়-গুরু'

(৮)

একদা এক ভক্ত শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীকে বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন যে—মহারাজ! আমার মত লোকের পক্ষে জ্ঞানী-পুরুষকে চেনা সম্ভব কি? তদুত্তরে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজী সহাস্যে বলিলেন—বহুমূল্য রত্নাদি যেমন জহুরী ভিন্ন অপরের পক্ষে চেনা সুকঠিন, সেইরূপ সাধারণের পক্ষে জ্ঞানী পুরুষকেও চেনা সহজ সাধ্য নহে। তবে তিনি যদি কৃপা করিয়া ধরা ছোঁয়া দেন তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞ জন শাস্ত্রীয় লক্ষণ দ্বারা তাঁহাদের চিনিতে পারেন। এতদ্ভিন্ন অন্য কোনও উপায় নাই।

এখন প্রশ্ন হইবে—জ্ঞানী পুরুষ বলিলে কাহাকে বুঝাইবে? তদুত্তরে তিনি বলিলেন—যাঁহারা অনিত্য বস্তুকে জানিয়া

ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিয়া সদৈব নিত্যে অবস্থিত রহিয়াছেন তাঁহারাই 'জ্ঞানী পুরুষ।' ইঁহাদের দুটি অবস্থা হয়—একটি জীবন্মুক্ত ও অপরটি বিদেহমুক্ত।

জীবন্মুক্ত তাঁহারাই—যাঁহাদের নিকট জগৎ থাকিয়াও (অসম্ভব ও বিপরীত ভাবনাদ্বয় না থাকায়) জাগতিক মোহ থাকে না। যে কারণে তাঁহারা জগতের বিষমাকার সকল বস্তুতে আত্মার কোনও তারতম্য দেখিতে পান না—

'বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥'

গীতা ৫।১৮

এইজন্যই তাঁহারা নিঃস্বার্থ পরিশুদ্ধ ব্যবহার দ্বারা লোক সমাজে আদর্শ স্থাপনে সক্ষম হন। গীতা বলেন—

যেন (জ্ঞানেন) বিভক্তেষু (পরস্পরভিন্নেষু) সতি সর্বভূতেষু (ব্রহ্মাদি স্থাবরান্তেষু) অবিভক্তম্ (প্রতিদেহং বিভক্তেষু দেহভেদেষু ন বিভক্তং স্বয়ং দেশকালবস্তুপরিচ্ছেদ শূন্যমিত্যর্থ) একম্ অব্যয়ং (উৎপত্তি বিনাশাদিসর্ববিকারশূন্যং নিত্যমির্থঃ) ভাবম্ (পরমাত্মতত্ত্বম্) ঈক্ষতে (আলোকয়তি) এতদেব বিদেহমুক্তিকারণম্।

সুতরাং দেখা যায় যে, বিদেহমুক্ত অবস্থা জীবন্মুক্ত অবস্থারই এক উচ্চস্তর মাত্র। এ অবস্থায় জগৎ থাকে না, কেবল আত্মাই থাকেন।

'সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥ গীতা ৬।২৯

বক্ষ্যমান অবস্থা প্রাপ্ত পুরুষকেই গীতা—'মহাত্মা' শব্দে অভিহিত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে—'বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।'

এইরূপ জ্ঞানী পুরুষ—

'নির্ধনোঽপি সদা তুষ্টোঽপ্যসহায়ো মহাবলঃ।
নিত্যতৃপ্তোঽপ্যভুঞ্জানোঽপ্যসমঃ সমদর্শনঃ॥'

তিনি নির্ধন হইয়াও সদা সন্তুষ্ট, অসহায় হইয়াও মহা-বলবান, ভোজন না করিয়াও নিত্যতৃপ্ত এবং ব্যবহারপরায়ণ হইয়াও সমদর্শী হইয়া থাকেন।

এখন দেখা যাক সমদর্শন কি? শাস্ত্র বলেন—

অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশপঞ্চকম্।
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততো দ্বয়ম্॥

অস্তি, ভাতি, প্রিয়, এবং নাম ও রূপ এই পাঁচটী লইয়া জগৎ! জগতের সর্বত্র এই পাঁচটী বস্তু বিদ্যমান। ইহার দুইটী অংশ। একটী সার—'ব্রহ্ম', অপরটী অসার—'জগৎ'। শাস্ত্র বলেন—'সর্বংখল্বিদং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।' তাহা হইলে ব্রহ্ম ও জগৎ না বলিয়া 'স্বর্ণালঙ্কারের ন্যায় ব্রহ্মের জগৎ' বলিলেই হয়। কেন না—স্বর্ণালঙ্কার বলিলে যেরূপ অলঙ্কার স্বর্ণ ভিন্ন অন্য কিছুই নয় দেখা যায়, সেইরূপ জগৎও

যে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু নয় বুঝা যায়। আবার যেমন স্বর্ণ হইতে অলঙ্কারের নাম ও রূপ পৃথক আছে, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতেও জগতের পৃথক নাম ও রূপ রহিয়াছে। আবার যেমন অলঙ্কারের নাম ও রূপ না থাকিলে স্বর্ণের অভাব হয় না, সেইরূপ জগতেরও নাম এবং রূপ না থাকিলে ব্রহ্মেরও অভাব হয় না। সুতরাং বিদেহমুক্তের নিকট জগৎ না থাকিলেও যে ব্রহ্ম থাকিবেন ইহা বলাই বাহুল্য। অতএব দেখা যায় যে, জীবন্মুক্ত ও বিদেহমুক্ত উভয়াবস্থা প্রাপ্ত আত্মতত্ত্ববিদ্‌গণের দ্বৈত দর্শন থাকে না, ইহাকেই সমদর্শন বলে।

জ্ঞানী পুরুষগণ আপেক্ষিক অনিত্য বস্তুর মধ্য হইতে কি করিয়া নিত্যবস্তু বাছিয়া লন তৎসম্বন্ধে একটি কাহিনী আছে। উহা বলিতেছি, সাবধান হইয়া শ্রবন কর। উহা নিম্নরূপ—

জনৈক রাজার পাখী পোষার বাতিক ছিল। নানা দেশের নানা জাতীর পাখী তিনি পুষিয়াছিলেন। রাজার এবম্প্রকার কৌতূহল জানিয়া এক মহাত্মা তাঁহার পাখী দেখিবার জন্য আসিলেন। মহাত্মা নানা প্রকার পাখী দেখিয়া বলিলেন, রাজন! আপনার চিড়িয়াখানায় নানা দেশের নানা রকমের পাখী দেখিলাম। কিন্তু রাজহংস দেখিলাম না। ইহা শুনিয়া রাজা মহাত্মার নিকট রাজহংসের পরিচয়ও উহার প্রাপ্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায়, মহাত্মা রাজাকে বলিলেন—রাজহংস সচরাচর পাওয়া যায় না। তবে অপনি যদি আপনার আঙ্গিনায় প্রত্যহ

দু চার মন অন্ন ছিটাইয়া রাখেন, তাহলে উহার লোভে দূর দূরান্তরের পক্ষীকূল অন্ন খাইবার জন্য আসিলে, হয়তো কোন না কোন দিন তাহাদের মধ্যে রাজহংসও আসিতে পারে।

রাজা মহাত্মার উপদেশ মত তাহাই করিলেন। প্রত্যহ অন্ন ছিটাইয়া দেন, নানা রকমের পাখী আসে কিন্তু রাজহংস আসে না। বহুদিন হইতে পক্ষীকূলের যাতায়াত দেখিয়া রাজহংসও তাহাদের সঙ্গ লইল এবং যথাস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা ইতিপূর্ব্বে এরূপ পাখী দেখেন নাই। নূতন রকমের পাখী দেখিয়া হয়ত বা ইহাই রাজহংস হইবে মনে করিয়া, রাজা মহাত্মাজাকে নূতন পাখীর সংবাদ দিলেন।

মহাত্মা রাজমুখে রাজহংসের পরিচয় পাইয়া রাজাকে বলিলেন যে, আপনার বর্ণনানুযায়ী মনে হইতেছে রাজহংসই আসিয়াছে কিন্তু উহার পরীক্ষার জন্য জলসহ দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া রাজহংসের সম্মুখে ধরুন। রাজহংস যদি উহার জলাংশ ত্যাগ করিয়া দুগ্ধ পান করিয়া লয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে রাজহংসই আসিয়াছে। ইহা শুনিয়া রাজা তাহাই করিলেন। রাজহংস সম্মুখস্থিত জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে দুগ্ধমাত্র পান করিল, অবশিষ্ট জল পড়িয়া রহিল। ইহা দেখিয়া রাজার রাজহংসের জ্ঞান হইল এবং আনন্দিত হইলেন।

ইহা শুনিয়া ভক্ত বলিলেন, মহারাজজী! জ্ঞানী পুরুষকে জানিবার জন্য, চিনিবার জন্য অন্য কোনও সহজ উপায়যদি থাকে

তাহা হইলে কৃপা করিয়া বলুন। তখন শ্রীশ্রীগুরুমহরাজজী বলিলেন—দেখ বাছা, যেমন অন্ন ছিটাইয়া দেওয়ায় পক্ষীকূলের সহিত রাজহংসও আসিয়াছিল, সেইরূপ যদি তুমি অন্নসত্র খুলিয়া দাও তাহা হইলে সাধারণ লোকের সহিত একদিন জ্ঞানীপুরুষও আসিবেন। রাজহংস যেমন জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে দুগ্ধ মাত্র পান করিয়াছিল, সেইরূপ জ্ঞানী পুরুষ অনিত্য মিশ্রিত নিত্য বস্তুতে যুক্ত থাকেন। অনিত্য বস্তুতে নিত্যবোধ, অশুচিতে শুচি বোধ, দুঃখেতে সুখবোধ এবং অনাত্মতে আত্মবোধই অবিদ্যা—

'অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা।

পাতঞ্জল ২।৫

অনন্তর রাজা মহাত্মার আদেশমত দীর্ঘদিন ব্যাপী অবারিত অন্নসত্রসহ নানা প্রকার সদনুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন। লোকমুখে ক্রমশঃ ইহার প্রচার হইল এবং সদনুষ্ঠান দর্শন লালসায় বহু জনসমাগম হইতে লাগিল। রাজার শুভানুষ্ঠানের ফলে একদিন এক জ্ঞানী পুরুষও সদনুষ্ঠানের দর্শন নিমিত্ত আসেন এবং রাজার সেবা গ্রহণ করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করেন। দেখ বাছা—শুভ ইচ্ছা পোষণ করিলে সৎ পুরুষ মিলিয়া যায়। অতএব সদা সর্ব্বদা মনকে শুভ ভাবনায়, শরীরেন্দ্রিয়কে শুভ কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিতে হয়। কারণ যে সময় চলিয়া যায় উহা আর ফিরিয়া আসে না। তাই নীতি শাস্ত্র বলেন—"শুভস্য শীঘ্রম্"।

জয়গুরু

(৯)

একদা জনৈক ইঞ্জিনায়ার ভক্ত শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদন করায় শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজী তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ দানের পর বলিলেন—আমার একটি সোপান নির্ম্মান করাইবার আছে। আপনি ইঞ্জিনীয়ার, উহা কি আপনি নির্মান করিয়া দিতে পারেন? তদুত্তরে ভক্ত বিনম্রভাবে বলিলেন,—আপনার আজ্ঞা হইলেই আমি সোপান নির্মান করিয়া দিব। তখন মধুর হাস্যে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজী বলিলেন—সংসার-দুঃখে নিপীড়িত জীবের জন্য মোক্ষধামে যাইবার উপযুক্ত একটি সোপান নির্মান করিতে হইবে।

এবম্প্রকার রহস্যাবৃত বাক্য শ্রবণে ভক্ত বলিলেন—মহারাজ! মোক্ষধামে যাইবার উপযোগী সোপান নির্মাণের মালমসলা তো আপনার নিকটই আছে। উহা আমাকে দিন, আমি মোক্ষধামের সোপান নির্মাণ করিয়া দিব। তখন শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজী সস্নেহে বলিলেন—বেশ বাছা, তৎসম্বন্ধে আমি যাহা বলিব তাহা সাবধান হইয়া শ্রবণ কর।

মোক্ষধামের সোপান নির্মাণের নানাপ্রকার মালমসলা আছে। সেই সকলের সাহায্যেই সোপান নির্মাণ হইতে পারে এবং উহার নির্মাণে অনেকেরই উপকার হইবে। ইহা শুনিয়া ভক্ত বলিলেন—মহারাজ! আমি খাইলে আমার ক্ষুধা নিবৃত্তি

হয়, অপরের হয় না। সুতরাং মোক্ষধামের সোপান আমি নির্মাণ করিলে অপরের উপকার হইবে কেমন করিয়া? তদুত্তরে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজী বলিলেন—শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

'যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥' গীতা ৩।২১

উক্ত প্রমাণের মূলে ব্যবহার ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, শ্রেষ্ঠ জন যাহা আচরণ করেন, অপরে উহার অনুবর্ত্তন করে। সুতরাং পরম্পরাসূত্রে সকলেরই উপকার হয়। তবে অধিকারী ভেদে সাধনরাজ্যে কতকগুলি সাধারণ ও বিশেষ নিয়ম আছে। উহার যথাযথ পালনে তত্তদ্ সাধনে সুবিধা হয়। ইমারৎ তৈয়ারীর পূর্বে যেমন সাধারণ নিয়মানুযায়ী উহার বুনিয়াদ্ মজবুদ্ করিতে হয় নচেৎ অল্পকালের মধ্যেই নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে, সেইরূপ মোক্ষধামের সোপান নির্মাণের পূর্বে উহার শরীররূপী বুনিয়াদকে মজবুদ্ করিতে হইবে। বুনিয়াদ যদি মজবুদ্ না হয়, তাহা হইলে মোক্ষধাম লাভের সিদ্ধিতে বিঘ্ন আসিবে। সেইজন্যই সাধারণ নিয়মে ধর্মশাস্ত্র বলেন—'শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম'। শ্রীভগবানও সাধনোপযোগী শরীর লাভের জন্য—যুক্ত-আহার, বিহার, কর্ম, নিদ্রা ও জাগরণের কথা বলিয়াছেন—

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥' গীতা ৬।১৭

সুতরাং সাত্ত্বিক, স্বাস্থ্যকর, আহ্লাদজনক, পরিমিত (কম

ও নয়, বেশী ও নয়) আহার্য্য ও চর্য্যা যোগ সাধনের পক্ষে শরীরোপযোগী। অপরিমিত (কম বা বেশী) আহার্য্য বা চর্য্যা শরীর ও মনকে সুস্থ রাখার পক্ষে অনুপযোগী। ঘৃত ও দুগ্ধ—স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর ও সাত্ত্বিক আহার। কিন্তু অধিক পরিমাণ সেবনে মেদাদি ধাতুর বৃদ্ধি হইতে পারে। আবার ফল মূল-ও স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর তথা সাত্ত্বিক অথচ অধিক সেবনে কফ ধাতুর বৃদ্ধি তথা পেটের অসুখ হওয়া অস্বাভাবিক নহে। শর্করা মধুর, উত্তেজক ও সাত্ত্বিক কিন্তু অধিক ব্যবহারে বীর্য্যস্থান দুষ্ট হইয়া থাকে। অপর পক্ষে ঐ সকল বস্তুর আদৌ অসেবনে শরীরও মনে ক্লান্তিআসিতে পারে। সুতরাং প্রয়োজন মত আহার ও ব্যবহারে যোগ হয় দুঃখনিবারক। অন্যথায় শরীরে ব্যাধি ও মনে অশান্তি আসিয়া যোগ সাধনে বিঘ্ন ঘটাইয়া থাকে। সুতরাং শরীর ও মনের সুস্থতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া মোক্ষধামে যাইবার পক্ষে চিত্তের প্রতিকূল বৃত্তিগুলির নিরোধ জন্য অষ্টাঙ্গযোগের বহিরঙ্গ পঞ্চসাধন (যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার) এবং স্বরূপস্থিতির জন্য উহার অন্তরঙ্গ সাধনত্রয়—ধারণা, ধ্যান ও সমাধি সহায়ে সাভ্যুদয়পূর্বক মোক্ষধামে (কৈবল্যধামে) যাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজী বলিলেন, অষ্টাঙ্গ যোগের (বহিরঙ্গ সাধনের পরিপক্কাবস্থায় অন্তরঙ্গ সাধনের যোগ্যতা আসে। বহিরঙ্গ সাধনে অপটু থাকিলে অন্তরঙ্গ সাধন হইবার নহে।)

সুতরাং অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহরূপ মালমসলা দিয়া, 'যম' নামীয় মোক্ষধামের প্রথম সোপান নির্ম্মিত হইবে। কারণ উক্ত পঞ্চ সাধনায় প্রতিষ্ঠিত হইলে তবে যম সাধন সম্পূর্ণ হয়। যম সাধনকালেই নিয়মাদি সাধনও অল্পাধিক করিতে হয়। যদিও উক্ত সাধনগুলি স্বয়ং সম্পূর্ণ তথাপি পূর্বাপর একে অন্যের পরিপোষক বলিয়া সমকালীন সাধনে সুফল পাওয়া যায়। এইজন্যই পরবর্ত্তীক পৌরাণিক ও তান্ত্রিক যুগের উপাসনার পদ্ধতিতে সংযম হইতে ধ্যান পর্য্যন্ত গৃহীত হইয়াছে।

মোক্ষধামের ১ম সোপানের ১ম মাল-মসলা— 'অহিংসা'। দ্বেষ্য ও ভোগ্য বুদ্ধিবশতঃ কোন দেশে বা কালে, কোনও-রূপে প্রাণীমাত্রের অনিষ্ট চিন্তা বা কার্য্য না করার নাম অহিংসা। যখন সাধক হিংসা ত্যাগ করে তখন কোন জীব হইতেই তাঁহার ভয় উপস্থিত হয় না। পুরাণে পাওয়া যায় পাঁচ বৎসরের বালক ধ্রুব শ্রীভগবানের দর্শন আশায় শ্বাপদাকীর্ণ অরণ্যের মধ্যে তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন। কিন্তু সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক বা সর্পাদি হিংস্র জন্তু হইতে তাঁহার ভয় আসে নাই। আজকালও ছোট শিশুর সহিত সাপের খেলা করার সংবাদ মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়। ইহার কারণ বালক ধ্রুবের মনে হিংসার ভাব ছিল না বলিয়াই কোনও হিংস্র জন্তু তাঁহাকে হিংসা করে নাই। সুতরাং যখন সাধকের অন্তঃকরণে অহিংসা পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন

তাঁহার নিকট সমাগত ক্রূর প্রকৃতির জীবের বৈরভাব প্রকাশিত না হইয়া সুপ্ত অবস্থাতেই থাকে। 'অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ' যো, দ ২।৩৫। (অহিংসার তারতম্যানুসারে সাধকের ক্রোধ, মদ ও মাৎসর্য্য যাহা হিংসার সহায়ক তাহার হ্রাস হইতে থাকে।) (অহিংসার পূর্ণ প্রতিষ্ঠায় ক্রোধ, মদ ও মাৎসর্য্য আদৌ থাকে না।)

মোক্ষধামের ১ম সোপানের ২য় মাল-মসলা— 'সত্য'। ভ্রমশূন্য ও সার্থক এবং ছলকাপট্যরহিত বাক্য—যাহাকে মনে ও মুখে এক বলে বা ঐরূপ আচরণ, যাহার দ্বারা ধর্ম্মের রক্ষা হয়, সমুদায় প্রাণীর উপকার ভিন্ন অপকার হয় না, তাহাই সত্য বাক্য ও আচরণ। ইহা উদাহরণ সাহায্যে স্পষ্ট করিয়া বলি :—

এক ব্যক্তি রাস্তার পার্শ্বে স্বীয় বাড়ীর বারান্দায় বসিয়া রহিয়াছে। এমন সময় একটি গাভী প্রাণভয়ে ছুটিতে ছুটিতে তাহার বাড়ীর উঠানে প্রবেশ করিল। ইত্যবসরে এক কসাই আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, এদিকে একটি গরু আসিয়াছে কি না? তদুত্তরে দর্শক যদি বলে যে—হ্যাঁ অসিয়াছে, আমার বাড়ীর উঠানে গিয়াছে। তাহা হইলে বাক্য সত্য হইবে না। কারণ ঐরূপ বাক্যের সাহায্যে একটি গরুর প্রাণ নাশ এবং কসাই ও বক্তার পাপ হইবে, সুতরাং ঐরূপ বাক্য অসত্য।

অপরপক্ষে এরূপক্ষেত্রে যদি বলে যে—কই, এদিকে

কোনও গরু আসে নাই, তাহা হইলে গাভীও প্রাণে বাঁচিবে এবং কসাই ও বক্তার পাপ হইবে না ; অতএব সকলেরই কল্যাণ হইবে। সুতরাং (অধিকাংশের পক্ষে ধর্ম্মতঃ কল্যাণপ্রদ বাক্যই হইতেছে)—'সত্যবাক্য' অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়ং হিতঞ্চ যৎ' গীতা ১৭।১৫। যখন সাধকের সত্যবাণী ও আচরণ স্বভাবে পরিণত হয়, ভুলক্রমেও যখন অসত্য বাক্য উচ্চারণ বা মিথ্যা আচরণ হয় না, তখন তাঁহার বাক্‌সিদ্ধি হয়। বাক্‌সিদ্ধ অবস্থায় সাধক ব্যর্থবাক্য অর্থাৎ যাহা হইবার নহে এরূপ বাক্য বলেন না বা ব্যর্থ আচরণও করেন না, তাই তাঁহার বাক্য ও আচরণ নিষ্ফল হয় না। 'সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্' যো, দ ২।৩৬। মোহ-বশতঃই লোকে ব্যর্থ বা অসত্য বাক্য বলে এবং তদনুরূপ আচরণও করে। সুতরাং সত্য প্রতিষ্ঠায় মোহ ভঙ্গ হয়।

মোক্ষ ধামের ১ম সোপানের ৩য় মাল-মসলা—'অস্তেয়'। অন্যায়পূর্বক অপরের দ্রব্য গ্রহণ করা অর্থাৎ অন্যের দ্রব্য তাহার অনুমতি ভিন্ন অসাক্ষাতে নিজের করিয়া লওয়ার নাম চুরি। ঐরূপ কর্ম্মের অভাব এবং অন্তকরণে ঐরূপ বৃত্তি উদিত না হওয়াকে অস্তেয় বলে। সাধকের অভাব বোধ থাকা পর্য্যন্ত লোভবৃত্তি থাকে। সুতরাং ভাবের ঘরে চুরিও হয়। কিন্তু যখন সাধনের প্রভাবে অভাব বোধ দূরীভূত হয় ও লোভ থাকে না, তখনই সাধকের অস্তেয় প্রতিষ্ঠা হয়। সাধক অস্তেয়

সাধনে প্রতিষ্ঠিত হইলে সংসারের কোন পদার্থই সাধকের অলব্ধ থাকে না, 'অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্বরত্নোপস্থানম' যো, দ ২।৩৮ এরূপ অবস্থায় সাধক সর্বজনের বিশ্বাসপাত্র হইয়া থাকে।

মোক্ষ ধামের ১ম সোপানের ৪র্থ মাল-মসলা—'ব্রহ্মচর্য্য'। এখানে সর্ব্বাবস্থায় সদা সর্ব্বদা কায়-মনো-বাক্যে বীর্য্য ধারণের নাম ব্রহ্মচর্য্য। শরীরের শ্রেষ্ঠ ধাতু বীর্য্য, উহার ধারণই জীবন এবং ত্যাগই মৃত্যু। বীর্য্যবান সাধকই দীর্ঘজীবী, নীরোগ, হৃষ্টপুষ্ট, বলবান, বুদ্ধিমান, তেজস্বী, ও দৃঢ় সংকল্পবান হইয়া থাকে। উহার ধরণে কষ্ট সহ্য করিবার শক্তি জন্মে। নানা প্রকার তপস্যা করিবার প্রবৃত্তি হয়। ব্রহ্মচর্য্যের বলেই সাধক প্রাণবায়ুর সাহায্যে শরীর ও মনের শুদ্ধি সাধনে নানা প্রকার যৌগিক ক্রিয়ায় সফলতা লাভ করে। ব্রহ্মচর্য্য ভিন্ন যোগাভ্যাস হয় না। কেবল উহাই নহে—রোগ মুক্তির জন্য, স্বাস্থ্যলাভের পক্ষে, বল ও বুদ্ধির বিকাশ হেতু এবং বিদ্যাভ্যাসে ব্রহ্মচর্য্যের অত্যন্ত আবশ্যক। 'যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি......' গীতা ৮।১১ অতএব—

'স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্।
সংকল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ॥

উক্ত অষ্টবিধরূপ মৈথুন ত্যাগে পূর্ণরূপে ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। এ অবস্থায় সাধক উর্দ্ধরেতা হইয়া অতুলনীয়

শারীরিক ও মানসিক বল লাভ করেন। 'ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ' যো, দ ২।৩৮। *

মোক্ষধামের ১ম সোপানের ৫ম মাল-মসলা—'অপরিগ্রহ'। সুখবুদ্ধিতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধাদি সমন্বিত বস্তু সংগ্রহ করার নাম পরিগ্রহ, আর কোনও অবস্থায় বা কালে উহা সংগ্রহ না করার নাম অপরিগ্রহ। সাধকের লোভ যতক্ষণ উদার না হয় ততক্ষণ তাঁহার অন্তঃকরণে কোনওরূপ স্থুল বিষয় ভোগের আকাঙ্খা জাগে না। আর লোভশূন্য অবস্থায় বৈরাগ্য ও উপরতিযুক্ত অন্তঃকরণে শান্তি বিরাজ করে এবং উহাই অপরিগ্রহের পূর্ণাবস্থা। এ অবস্থায় সাধকের পূর্বাপর সাধনগুলি 'দৃঢ়ভূমি' লাভ করে। তজ্জন্য চিত্ত-চাঞ্চল্যের কারণগুলি বহুলাংশে নষ্ট হওয়ায় সাধক পূর্বাপর ও বর্তমান জন্মের সমস্ত বিষয় ও উহার কারণ অবগত হইয়া থাকেন,—'অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে জন্মকথন্তাসংবোধঃ' যো, দ ২।৩৯।

উক্ত পাঁচটি সাধন (পাঁচরকমের মাল-মসলা) এর সমবায়ে মোক্ষধামের 'যম' নামীয় প্রথম সোপান। যদিও সাংসারিক জীবনে জাতি, দেশ, কাল ও নিমিত্তের বিচারের অনুপাতেই সাধন ক্রমশঃ সহজসাধ্য হয়, কিন্তু উহাতে অভ্যাসে শৈথিল্য আসা খুবই স্বাভাবিক। তজ্জন্য সাধক দৃঢ়ব্রত হইয়া কোনও দেশে বা কালে জীবের সহিত কোনও কারণে পক্ষপাতী না হইয়া সার্বভৌম লক্ষ্যে স্থির থাকিয়া যম সাধনের অন্তরায়

হিংসা, অসত্য, চুরি, ব্যভিচাররূপ কর্ম ও ভোগান্বিত বুদ্ধিতে সামগ্রী সংগ্রহ না করতঃ 'মহাব্রত' ধারণে যম সাধনায় অল্প সময়ে পূর্ণতা লাভ করিবেন। সাধক যমের সিদ্ধাবস্থায় যদিও কামাদি ষড়রিপু অনুকূলভাব ধারণে স্থূল কামনা বাসনা হইতে মুক্ত থাকেন, তথাপি যম সিদ্ধিজন্য অধিক লোভনীয় সূক্ষ্ম দিব্যভোগের বাসনা সময়ে সময়ে সাধককে চঞ্চল করিয়া তোলে। তজ্জন্য এ সময়ে সাধককে অত্যন্ত সতর্ক থাকিয়া পরবর্ত্তী সাধনে অধিকতর মনোনিবেশ করিতে হয়।

(১০)

পরদিন সৎসঙ্গ সভায় শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ বলিলেন, পূর্ব্বদিন আমি যোগাঙ্গের 'যম' সাধন সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলিয়াছি। আশাকরি তোমরা সকলেই উহা অনুধাবন করিয়াছ। উক্ত বৈরাগ্যমূলক 'যম' সাধনার পরিপক্বাবস্থায়, স্থূলবিষয়-ভোগজনিত মন ও ইন্দ্রিয়বর্গের চাঞ্চল্যাদি দোষের কথঞ্চিৎ উপশম হেতু অষ্টাঙ্গযোগের পরবর্ত্তী দ্বিতীয় অঙ্গ— 'নিয়ম' এর সাধনগুলি অধিক যত্নের সহিত সাধনে সাধক সচেষ্ট হইলে ; তবে সাধনায় সাধকের বেগ মৃদু হইতে মধ্য ও মধ্য হইতে তীব্র হয়। যে কারণে সাধক স্থৈর্য্য অবলম্বনে নিজ লক্ষ্যভেদে অধিকতর সফলতা লাভ করে।

এখন মোক্ষধামের দ্বিতীয় সোপানের কথা বলিব, সাবধান হইয়া শোন। শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধানরূপ মাল-মসলা দিয়াই মোক্ষধামের 'নিয়ম' নামীয় দ্বিতীয় সোপান নির্ম্মিত হইবে।

মোক্ষধামের দ্বিতীয় সোপানের ১ম মাল-মসলা—'শৌচ'। শৌচ (পবিত্রতা) দ্বিবিধ---"বাহ্য ও অভ্যন্তর" শরীরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার নাম বাহ্যশৌচ এবং চিত্তমল প্রক্ষালনকে আভ্যন্তর শৌচ বলা হয়। মৃত্তিকাদি অবলেপন ও জলের সাহায্যে শরীরের ও ইন্দ্রিয়বর্গের মলাপনয়ন করিতে হয়। আর শরীরের অভ্যন্তরবর্ত্তী পিত্ত ও শ্লেষ্মাদিরূপ মলাপনয়ন জন্য হঠ যোগান্তর্গত 'বারিসার ও বহ্নিসার' ক্রিয়া অন্য উপায় অপেক্ষা বিশেষ উপযোগী। কিন্তু সাধক মাত্রকেই যে উহার সাহায্য লইতে হইবে এমন নহে, তবে যাহাদের শরীরাভ্যন্তরে উক্ত মলের আধিক্য হয় বা থাকে, তাহাদের পক্ষে উহা অতীব হিতকারী। পেট পরিষ্কার রাখিবার জন্য অল্প মাত্রায় হরিতকী সেবনে অথবা 'বস্তি' ক্রিয়া বা আধুনিক প্রচলিত 'ডুশ' ব্যবহারে ফল ভাল হয়। তবে পেটে জল লইয়া 'নৌলী' ক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক, পরে পেটের জল বাহির করিয়া দিতে হয়, অন্যথায় পেটের অভ্যন্তরস্থিত সমস্ত জল বাহির হয় না, তজ্জন্য নানারূপ পীড়ার সম্ভাবনা থাকে। উহা সাধকের স্বাস্থ্যকে সুরক্ষিত রাখে। স্বাস্থ্য সুস্থ না থাকিলে যোগসাধন

হয় না। শ্রুতি বলেন,—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। কিন্তু ক্রিয়াসমূহের অভ্যাস করিতে হয় পটু অভ্যাসীর সান্নিধ্যে থাকিয়া নচেৎ উহা আয়ত্তে আসিতে বহু বিলম্ব ঘটে। কিন্তু যে সকল সাধক আহার ও বিহারে সমতা রক্ষার জন্য সংযম পূর্ব্বক চলেন, তাহাদের শরীরাদি স্বভাবতঃই মলশূন্য থাকে। সুতরাং তাহাদের উক্ত ক্রিয়া সমূহের বিশেষ প্রয়োজন হয় না।

নিজ শরীরের প্রতি স্বভাবতঃই সুন্দরতা, প্রিয়তা ও প্রবিত্রতা বোধ থাকে। কিন্তু সাধক বাহ্যশৌচে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে সে ভাব আর থাকে না। তখন তাহার মলান্বিত শরীরের প্রতি ঘৃণা আসে এবং শরীর সঙ্গই অপবিত্রতাদির মূলকারণ বলিয়া সে মনে করে। সুতরাং শরীরের প্রতি সাধক অনাসক্ত হইয়া পড়ে। এমতাবস্থায় তাহার অন্য শরীরের উপর প্রীতিবোধ বা উহার সহিত সংসর্গেচ্ছাও যে থাকে না, ইহা বলাই বাহুল্য। এই অবস্থাতেই বেদান্ত কথিত শোভনাধ্যাসের মূল নড়িয়া উঠে। 'শৌচাৎসাঙ্গজুগুপ্সাপরৈরসংসর্গশ্চ' যো, দ ২।৪০।

আর পুণ্যবানেরপ্রতি—মৈত্রী, দুঃখিতের প্রতি—দয়া, সুখীরপ্রতি—প্রীতি ও পাপাচারীর প্রতি—উদাসীনতা অভ্যাসে অহঙ্কার ও মমতা জনিত যাবতীয় দুর্গুণের ত্যাগে আভ্যন্তরিক শৌচ প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন সাধকের সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হেতু রাগদ্বেষজ দুর্গুণের অভাব অবস্থায় তাহার 'সত্ত্বশুদ্ধি'

হয়। এমতাবস্থায় অন্তঃকরণ নির্ম্মলতার কারণ মনোমধ্যে যে অনাবিল আনন্দ প্রবাহ বিদ্যমান থাকে তাহাকেই বলা হয়—সৌমনস্য ; যাহা সত্ত্বশুদ্ধির অবশ্যম্ভাবী ফল। এবম্প্রকার মানসিক প্রসন্নতায় মন—'একাগ্র' হয়। উক্ত অবস্থায় ইন্দ্রিয়বর্গের স্বাভাবিকী বিষয় প্রবণতা থাকে না, সুতরাং উহাদের চঞ্চলতাও নষ্ট হয়--উহাকেই ইন্দ্রিয় জয় কহে। তখন সাধকের অন্তঃকরণ আত্ম দর্শনের যোগ্যতা লাভ করে। যাহা শৌচ প্রতিষ্ঠার চরম ফল। 'সত্ত্বশুদ্ধি সৌমনস্যৈ-কাগ্রেন্দ্রিয়জয়াত্মদর্শন যোগ্যত্বানি চ' যো, দ ২।৪১।

মোক্ষধামের দ্বিতীয় সোপানের ২য় মাল মসলা—'সন্তোষ'। সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অভাব থাকা সত্ত্বেও যে মনের প্রসন্ন ভাব তাহাকেই সন্তোষ বলা হয়। সেইজন্য শাস্ত্র বলেন—'সর্ব্বত্র সম্পদস্তস্য সন্তুষ্টং যস্য মানসম্'। অন্যত্রও বলা হইয়াছে—সাংসারিক কামনা (ধন বল, সম্পত্তি, স্ত্রী, পুত্র, যশ ও প্রভুত্ব) সমূহের পূর্ত্তিতে যে সুখ বা মহান দিব্য (স্বর্গ) সম্বন্ধী যে সুখ, তাহা তৃষ্ণাক্ষয় জনিত সুখের ষোড়শাংশও নহে। কারণ বিষয় ক্ষণস্থায়ী ও আত্মমোহকারী বলিয়া তৎসম্বন্ধীয় সুখও তদ্ধর্ম্ম বিশিষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং বিষয় সুখ সুখই নহে, সুখাভাস মাত্র। অপর পক্ষে কামনা শূন্য একাগ্রনিষ্ঠ চিত্ত দর্পনে আত্মার প্রতিষ্ঠা ভাসিত হওয়ায়, সাধকের অন্তঃকরণে বাসনা জাগে না; তজ্জন্য দুঃখও থাকে না।

অতএব তখন সাধকের অত্যুত্তম অবিনশ্বর সুখ লাভ হয়। 'সন্তোষাদনুত্তম সুখলাভঃ,' যো, দ ২।৪২।

মোক্ষধামের দ্বিতীয় সোপানের ৩য় মাল-মসলা—'তপস্যা।' শরীর ও ইন্দ্রিয়বর্গের অশুদ্ধিক্ষয় হেতু এবং সুখ ও দুঃখে সমতা রক্ষার জন্য বিষয় সুখ ত্যাগ করিয়া বিহিত ব্রত নিষ্কাম ভাবে আচরণ করার পক্ষে যে কষ্ট স্বীকার করা হয়, তাহাকেই সাত্ত্বিক তপস্যা কহে। শ্রীগীতা বলেন—অফলাকঙ্ক্ষিভি ঃ (ফলাভিসন্ধি শূন্যৈঃ) যুক্তৈঃ (একাগ্র চিত্তৈঃ) পরয়া (শ্রেষ্ঠয়া) শ্রদ্ধয়া (আস্তিক্য বুদ্ধ্যা) তপ্তং (অনুষ্ঠিতং) যত্তপঃ তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে; ১৭।১৭। তপস্যা সকামও হয়, কিন্তু উহার সেবনে অহঙ্কার বাড়িয়া যায়; তজ্জন্য সকাম তপস্যা যোগাঙ্গ নহে। অপর পক্ষে যে তপস্যায় অহঙ্কার ক্ষীণ হয়, শরীরগত ধাতুর সাম্য নষ্ট হয় না, সেই তপস্যাই যোগাঙ্গ। সুতরাং সাত্ত্বিক তপস্যাই সাধকের অভ্যসনীয়।

যাহারা অল্পমাত্র দুঃখেই বিচলিত হয়, তাহারা যোগাভ্যাস করিতে পারে না। তাই ক্ষুৎ-পিপাসায়—শীতাতপে—আধিব্যাধিতে সমতা লাভের জন্য সহিষ্ণুতারূপ তপস্যার অভ্যাস করিতে হয়। শরীর কষ্ট সহিষ্ণু হইলে, মন স্থৈর্য্য লাভ করিলে, যোগ সাধনে উত্তম অধিকার আসে। (তপস্যারহিত সাধকের যোগসিদ্ধি হয় না।) শ্রুতি বলেন—'ন তত্র দক্ষিণা যান্তি নাবিদ্বাংসস্তপস্বিনঃ'। (কারণ বিনা তপস্যায়

অনাদিকৰ্ম্ম এবং অবিদ্যাদি ক্লেশের বাসনাজাত বিষয় সমূহ ও অন্তঃকরণের নানাবিধ মল সম্পূর্ণরূপে ক্ষীণ হইতে পারে না।) রজস্তমোগুণ সমুদ্ভুত পাপরূপ মল ও বিক্ষেপ দ্বারা স্বভাবতঃই সাধকের অভ্যন্তরীণ সমস্ত শক্তি সঙ্কুচিত থাকে, কিন্তু তপস্যার প্রভাবে উহার অশুদ্ধি ক্ষয় হইলে 'অনিমাদি' কায়সিদ্ধি ও 'দূরদর্শন' প্রভৃতি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়শক্তির পূর্ণ পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পায়। রজস্তমোগুণ বিনষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত উহা হয় না। 'কায়েন্দ্রিয় সিদ্ধিরশুদ্ধি ক্ষয়াত্তপসঃ;' যো, দ ২।৪৩।

মোক্ষধামের দ্বিতীয় সোপানের ৪র্থ মাল-মসলা—'স্বাধ্যায়'। 'স্বাধ্যায়ো জপ ইত্যুক্তো বেদাধ্যয়ন কর্ম্মনি' মনু। বেদ অথবা বেদ সম্মত মোক্ষ ধর্ম্মোপদেশক সৎশাস্ত্র সমূহ অধ্যয়ন এবং ঈশ্বরের স্বরূপবাচক—'প্রণব' মন্ত্র জপ ও স্তুতি বা নিজ নিজ ইষ্ট দেবতার মন্ত্রাদির জপ ও স্তোত্রাদির আবৃত্তি-'স্বাধ্যায়' নামে অভিহিত হয়। স্বাধ্যায়-হইতে বিষয়চিন্তা ক্ষীণ,-পরমার্থে রুচি ও জ্ঞান বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তজ্জন্যই উপনিষদ বলিয়াছেন—'স্বাধ্যায়ন মা প্রমদঃ'। (যাহার ফলে আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করা সম্ভবপর হইয়া উঠে এবং বুদ্ধি শুদ্ধ হইয়া ইষ্ট দেবতার দর্শন লাভে ধন্য হয়।) একথা, কল্পনা মাত্র নহে কিন্তু সন্দেহাতীত। 'স্বাধ্যায়াদিষ্ট দেবতা সম্প্রয়োগঃ,' যো, দ ২।৪৪।

মোক্ষধামের দ্বিতীয় সোপানের ৫ম মাল-মসলা—'ঈশ্বর প্রণিধান'। ইহা কেবল মোক্ষধামের দ্বিতীয় সোপানেরই নহে,

বরং সমগ্র যোগ সিদ্ধির প্রাণ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ঈশ্বর-প্রনিধানের পূর্ব্বে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান পরম আবশ্যক। সেই জন্য যোগদর্শন কার তিনটি সূত্রের সাহায্যে ঈশ্বর সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান পরিবেষন করিয়াছেন।

১ম সূত্রে বলিয়াছেন যে—অবিদ্যাদি ক্লেশ, পুণ্য ও পাপরূপ কর্ম্ম ও উহার বিপাকজ ফল এবং তজ্জনিত বাসনানুরূপ আশয় (সংস্কার) এর সহিত সম্বন্ধ নাই, এমন যে পুরুষ বিশেষ—তিনিই 'ঈশ্বর'। 'ক্লেশ কর্ম্ম বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষ বিশেষ ঈশ্বরঃ;' যো, দ ১।২৪। উক্ত ক্লেশাদির সহিত জীবেরই সম্বন্ধ থাকে। ঈশ্বর—মুক্ত পুরুষ বা প্রকৃতি লীনদের মতন নহেন। কারণ মুক্ত পুরুষের পূর্ব্ব-বন্ধ কোটি জানা যায় আর প্রকৃতি লীনদের উত্তর বন্ধ-কোটির সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু ঈশ্বরের ঐরূপ কিছুই নাই। তিনি সদাই মুক্ত।

২য় সূত্রে কহিয়াছেন যে—ঈশ্বরে যৎপরোনাস্তি সর্ব্বজ্ঞতা বীজ বর্ত্তমান। (মুক্ত পুরুষেরাও সর্ব্বজ্ঞ হইয়া থাকেন বটে, কিন্তু নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন না।) ঈশ্বরই একমাত্র অদ্বিতীয় জ্ঞানী, তাঁহাতেই জ্ঞানের চরম পরিসমাপ্তি হইয়াছে। 'তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞ বীজম্,' যো, দ ১।১৫।

৩য় সূত্রে গাহিয়াছেন যে—কালকৃত সীমা দ্বারা বদ্ধ না হওয়ায় তিনি (ঈশ্বর) পূর্ব্ববর্ত্তী সকলেরই গুরু। ঈশ্বর ভিন্ন সকলেই কালকৃত সীমা দ্বারা বদ্ধ হয়েন। কিন্তু ঈশ্বর কোন

কালেই আবদ্ধ হন না। তিনি সকলের আদি পুরুষ এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে একইরূপে বিরাজিত আছেন। তাই তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকলেরই জ্ঞান গুরু। 'স এষ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ,' যো, দ ১।২৬।

উক্ত তিনটি সূত্রের সাহায্যে—নিত্য মুক্ত, অদ্বিতীয় জ্ঞানী শাশ্বত পুরুষ বিশেষকেই ঈশ্বর বলা হইয়াছে। এবম্‌রূপ ঈশ্বরে প্রণিধান (রতি ও মতি) করিতে হইবে। সুতরাং ঈশ্বরকে পরম প্রাপ্য ও পরম আত্মীয় জ্ঞানে তাঁহাতে অশেষ কর্ম্মফল অর্পণ করিতে হইবে এবং তাঁহার প্রীতি কামনায় তাঁহার স্বরূপ মন্ত্র—'প্রণব' এর সবিধি জপই হইতেছে—'প্রণিধান' পদবাচ্য। সবিধি জপ ততদিনই করিতে হয়, যতদিন পর্যন্ত্য জপকার্য্যের জন্য চেষ্টার প্রয়োজন হয়। ইহাই হইতেছে নিয়মাঙ্গের ঈশ্বর প্রণিধান। কিন্তু ঐ জপ যখন শ্বাস প্রশ্বাসের মতন আপনা আপনিই হয়, চেষ্টার কোনও প্রয়োজন থাকে না তখন উহা হয় সমাধি অঙ্গের ঈশ্বর প্রণিধান। সেইজন্য ঈশ্বর প্রণিধান কেবলমাত্র নিয়মাঙ্গেরই সাধন নহে, অপিতু সমাধি সাধনেরও সাক্ষাৎ কারণ। তাই যোগশাস্ত্রকার কীর্ত্তন করিয়াছেন—'সমাধি সিদ্ধিরীশ্বর প্রণিধানাৎ, যো, দ ২।৪৫।

যোগদর্শনকার ঈশ্বর স্বরূপের বাচকরূপে— 'প্রণব' কেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'তস্য বাচকঃ প্রণবঃ,' যো, দ ১।২৭। অন্যত্র ও বলা হইয়াছে—

নমঃ প্রণব বাচ্যায় নমঃ প্রণব লিঙ্গিনে।
নমঃ সৃষ্ট্যাদি কর্ত্রে চ নমঃ পঞ্চ মুখায়তে ॥
সদা জপন্ সদাধ্যায়ঞ্ছিবং প্রণব রূপিনম্।
সমাধিস্থ মহাযোগী শিব এব ন সংশয়ঃ ॥

সুতরাং আদি গুরু যোগীশ্বর শঙ্কর ভাগবানই এস্থলে 'প্রণব' মন্ত্রের বাচ্য। উক্ত মন্ত্রের জপবিধি—(ঋষিন্যাস, মন্ত্রন্যাস, করন্যাস, অঙ্গন্যাস, ধ্যান, জপ সমর্পণ ও নমস্কার—) সহ জপকার্য্য বিধেয়। জপকার্য্য কি প্রকারে করিতে হইবে অর্থাৎ জপের স্বরূপটি কি প্রকারের হইবে, তাহার আভাস যোগদর্শন-কার দিয়াছেন—'তজ্জপস্তদর্থভাবনম্,' যো, দ ১৷৩৮ অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভাবণার মধ্যে রাখিয়া জপকার্য্য হইবে। উক্ত ভাবনার স্বরূপ সম্বন্ধে—গোস্বামী জী বলিয়াছেন—

'কামিহি নারি পিয়ারি জিমি লোভিহি প্রিয় জিমিদাম।
তিমি রঘুনাথ নিরন্তর প্রিয় লাগহু মোহি রাম ॥'

অর্থাৎ ভাবনা যেন অন্য কোনও বিষয় বস্তুতে না থাকে, ইহাই তাৎপর্য্য।

যম ও নিয়ম সাধন কালে 'বিতর্ক'—(কৃত, কারিত, অনুমোদিত, ক্রোধ, লোভ ও মোহ পূর্ব্বক আচরিত; মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র—হিংসা, অসত্য, স্তেয়, অব্রহ্মচর্য্য ও পরিগ্রহ এবং অপবিত্রতা, অসন্তোষ, অতপস্যা, অনধ্যায় ও ঈশ্বরে অবিশ্বাস আদি ভাবনা সমূহ বিঘ্ন উৎপাদন করে। (যেমন

দেখা যায় যে লোকাপবাদ, রাজদণ্ড বা নরকাদির ভয়ে অনেকে অন্যায় কার্য্য করে না।) সেইরূপ উক্ত বিঘ্ন অতিক্রম জন্য 'প্রতিপক্ষ' ভাবনা করিতে হয়। অর্থাৎ অহিংসাদির বিরোধী অজ্ঞানজ হিংসাদি বৃত্তির সম্ভাবিত দুঃখ-তাপরূপ কুফলের ভাবনায় উক্ত বিঘ্নও অপসৃত হইয়া থাকে। 'বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষ ভাবনম্' যো, দ ২।৩৩।

সাধনা দীর্ঘদিন (২।৪ মাস বা বৎসর নয়, সিদ্ধি পর্য্যন্ত) নিরন্তর (দিনের মধ্যে কেবল ২।১ ঘণ্টা নয়, অনুক্ষণ) সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা ও বীর্য্য সমন্বিত হইয়া (কাজ সারা মাত্র নয়, আন্তরিকতার সহিত) পরম প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ জ্ঞানে স্বজাতীয় (অনুকূল) প্রত্যয় প্রবাহ, পতিত পাবনী ৺গঙ্গাদেবীর অবিচ্ছিন্ন স্রোতের ন্যায় চলিতে থাকিলে তবে উহা দৃঢ়ভূমি লাভ করে। (নিয়মিত অভ্যাসই স্বভাবে পরিণত হয়। এই জন্যই সাধনায় দীর্ঘকালের আবশ্যকতা হয়। কারণ অভ্যাস নিয়মিত না হইয়া খুশী খেয়াল মত হইলে, সেরূপ অভ্যাসের ফলে জৈবী প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হয় না। সুতরাং সাধনা মাত্রেরই ফল লাভ জন্য চাই—নিয়মিত ভাবে সাধনার অনুষ্ঠান।) 'সতু দীর্ঘকাল নৈরন্তর্য্য সৎকারা সেবিত দৃঢ়ভূমিঃ,' যো, দ ১।১৪।

(অহিংসাদি যম ও শৌচাদি নিয়মকে ধর্ম্মশাস্ত্র 'সদাচার' বলেন। সদাচার হীন মনুষ্যের ধর্ম্ম জীবন লাভের কথা দূরে থাক্, নৈতিক জীবনেরই প্রতিষ্ঠা হয় না।) তাই ধর্ম্মশাস্ত্র বলেন

—,আচারঃ প্রথমো ধর্ম্মঃ। সদাচার হীন মনুষ্য অন্য কোন উপায়েই পবিত্র হইতে পারে না। (এমন কি সমস্ত বেদ বেদান্ত অধীত মনুষ্যও যদি সদাচার পালন না করেন, তাহা হইলে তিনিও পবিত্র হইতে পারেন না।) 'আচারহীনা ন পুনন্তি বেদাঃ' সুতরাং (সকলের স র্বাগ্রে সদাচারী হওয়া বিশেষ কর্ত্তব্য)।

জয়গুরু।

নোটঃ—

বারিসার—আস্তে আস্তে আকণ্ঠ জল পানকরতঃ ঐ জল উদরে চালিত করিয়া অধোমার্গ দিয়া বাহির করা।

বহ্নিসার—নাভিস্থানকে মেরুদণ্ডের সহিত একশতবার সংস্পর্শ করা।

নৌলী—সমস্ত বায়ু বাহির করতঃ নাভিস্থান উত্তোলন করিয়া দুই পার্শ্বের দুইটি বড় নলকে প্রবল বেগে ঘুড়ান।

বস্তি—নাভি মগ্ন জলে অবস্থান করতঃ উৎকটাসনে (গোড়ালী উপরে উঠাইয়া উহার উপর ভর করিয়া) উপবেশনান্তর গুহ্যদেশ প্রসারণ করতঃ আকুঞ্চন কালে নাতিশীতোষ্ণ জল উদরের মধ্যে লইয়া পুনরায় গুহ্যদেশ প্রসারণ কালে উক্ত জল বাহির করিয়া দেওয়া (যেমন পিচকারী জল গ্রহণ করে ও ফেলিয়া দেয়)।

—সমাপ্ত—

'সংশোধন'

১ পৃষ্ঠা ৯ পংক্তিতে 'সেই মহাপুরুষ ইতিহাস প্রসিদ্ধ উজ্জয়িনী' স্থলে
'ইতিহাস প্রসিদ্ধ সেই উজ্জয়িনী' হইবে।

১ ,, ১৩ ,, 'পরিবারে শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী' স্থলে
'পরিবারে মহাপুরুষ......' ,,

২ ,, ১৮ ,, 'নব বর্ষ' স্থলে 'নবম বর্ষ' হইবে।

৬ ,, ১৬ ,, 'উৎবব' ,, 'উৎসব' ,,

২৬ ,, ২ ,, 'প্রাবাহ' ,, 'প্রবাহ' ,,

২৯ ,, ৪ ,, 'মারিবেনই' ,, 'মরিবেনই' ,,

৫১ ,, ১৬ ,, 'অপরাধীর' ,, 'অপরাধী' ,,

৫৭ ,, ১৮ ,, 'একদা পার্ব্বতী মহারানী' ,, 'একদা শঙ্কর ভগবান পার্ব্বতী মহারানীকে' ,,

৮৬ ,, ৯ ,, 'দঢ়' ,, 'দৃঢ়' ,,

৮৬ ,, ১০ ,, 'ধরণে' ,, 'ধারণে' ,,

'গ্রন্থকারের শেষ কথা'

মহাপুরুষের বাণী প্রকাশন জন্য আমার তিন জন গুরু ভগ্নী আর্থিক সাহায্য করিয়াছেন। তন্মধ্যে আঠার বাড়ীর মা শ্রীমতি বীণাপাণি রায় চৌধুরী মহাশয়া অর্দ্ধেক ব্যয় ভার বহন করিয়াছেন। তাঁহাদের সাহায্য ভিন্ন এই পুস্তক প্রকাশন আমার পক্ষে সম্ভব হইত না। শ্রীসুদর্শণ পত্রিকার বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রদ্ধাভাজনে শ্রীশিশির কুমার ব্রহ্মচারী মহাশয় এই প্রবন্ধগুলি তাঁহার পত্রিকায় ইতিপূর্ব্বে বাহির করিয়া আমাকে প্রকাশন পক্ষে সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগুরু-মহারাজজী তাঁহাদের কল্যান বিধান করুন। শেষ আমার শুভেচ্ছা জানাই। জয়গুরু।